আমাদের গল্প

আমাদের গল্প

সাদাত শাহরিয়ার

জাগৃতি প্রকাশনী

আমাদের গল্প // সাদাত শাহরিয়ার

প্রথম প্রকাশ	:	ফেব্রুয়ারি ২০১২
প্রকাশক	:	ফয়সল আরেফিন দীপন
		জাগৃতি প্রকাশনী
		৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট
		নীচতলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
আলাপন	:	৮৬২৩২৩০
কার্যালয়	:	৪২/এ আজিজ সুপার মার্কেট
		২য় তলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
আলাপন	:	৮৬২৪২১৮
প্রচ্ছদ	:	ফয়সল আরেফিন
মুদ্রণ	:	দি ঢাকা প্রিন্টার্স
		পান্থপথ, গ্রীনরোড, ঢাকা
মূল্য	:	**একশত পঁচিশ টাকা**
ISBN	:	978 984 8416 77 8

উ ৎ স র্গ

আমার মা, বাবা এবং আপিকে

আমি মনে করি, আমরা যা দেখি, শুনি কিংবা করি তা-ই এক একটা ছোটগল্প। প্রতিটা মানুষের প্রতিটা নিঃশ্বাসই ছোটগল্পের যেন এক একটা লাইন। এখানে আমি যে গল্পগুলো লিখেছি সেগুলো সবই নানান মানুষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার এক একটি লিখিত দৃশ্যায়ন। বলতে দ্বিধা নেই আমার প্রতিটা গল্পেরই ঘটনা এবং চরিত্র সত্য বাস্তবের উপর ভিত্তি করে লেখা। তাই আমি আশা করতে পারি এগুলো সবার ভাল লাগবে।

সাদাত শাহরিয়ার

sadatruet@yahoo.com

সূ চি প ত্র

প্রহেলিকা

কর্পোরেট সাউন্ড!

একটি সাধারণ গল্প

তিশার বাসর!

হারমাফ্রোডাইট

গ্রহণের কাল

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা

মহালয়া

হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন

একটি লোমহর্ষক মাইক্রো গল্প!

পাগল!

বিপরীত শব্দ

ভূমিকম্প

ফার্স্ট লাভ

বিকেল পাচটা

লুঙ্গি সন্ত্রাস!

হিমেল, তোমার জন্য...

খেলা

এক টিকিটে দুই ছবি!!!

প্রশ্ন

বৈশাখী ঝড়!

থার্ড পারসন

ভিতর বাহির

হরতালের শেষ বিকেলে

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল ;

মানুষকে স্থির -স্থিরতর হতে দেবে না সময় ;

সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্তনদী।

অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়

দূর সাগরের শব্দ - শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে ;

কাল কিছু হয়েছিল; - হবে কি শ্বাশ্বতকাল পরে।

--- জীবনানন্দ দাশ

প্রহেলিকা

[এক]

- না মা, আমি পারব না। এভাবে একটা লোককে আমি ঠকাতে পারব না।

- আশ্চর্য! এতে ঠকানোর কি আছে?

- আছে। আমি বলতে পারব না।

- কেন বলতে পারবি না?

- পারব না। তুমি জান না?

- জানি বলেই তো বলছি এতে ঠকানোর কিছু নেই। তাছাড়া তোর তো কোন দোষ ছিল না। আর আজকালকার ছেলেমেয়েদের জীবনে এসব ঘটতেই পারে। শোন্ মা, ছেলে হিসেবে জাভেদ বেশ ভাল। আমি কথা বলে দেখেছি। আমার ভাল লেগেছে। আমার বিশ্বাস তোরও ভাল লাগবে।

- না মা, কোন ছেলেকেই এখন আর আমার ভাল লাগে না। ওরা মেয়েদের মেয়ে মনে করে না। ভোগের বস্তু মনে করে।

- শোন্ নিশাত, বেশি বড় বড় কথা বলবি না। তোর এসব কথা পত্রিকার পাতা বা বইয়ে পড়তে ভাল লাগে। এখন কাজের সময়ে এসব ভাল লাগে না। তাছাড়া তুই কয়টা ছেলেকে দেখেছিস? আচ্ছা হাতের পাঁচ আঙুল কি সমান? সবাইকে তুই একই সারির ভাবছিস কেন? এত বেশি বুঝিস কেন তুই? অনেক হয়েছে। আর না। আমার শেষ কথা হচ্ছে, ঠকানো-জেতানো ওসব বুঝি-টুঝি না। তোকে জাভেদকেই বিয়ে করতে হবে। আমি এ সপ্তাহেই তোর বিয়ে দেব।

- কিন্তু মা...!

- আবার কিন্তু?

- ওনাকে কি কিছু জানাবো না?

- পাগল নাকি? এসব কথা প্রপোজাল ম্যারেজে জানাতে হয় না।

- কিন্তু বিয়ের পর যদি কোনভাবে জেনে যায়... তাহলে?

- কিভাবে জানবে? আর যদি তেমন কিছু ঘটে তো পরে দেখা যাবে। শোন্ তুই আবার আগ বাড়িয়ে কিছু বলিস না। পৃথিবীতে এমন কিছু সত্য আছে যা কেবল নিজের জন্য, সবচেয়ে আপনজনকেও জানাতে হয় না।

[দুই]

এটা বোধহয় পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়ম যে, বাসর রাতে বর-কনে দুজনেই নার্ভাস থাকে। একদিকে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত, অন্যদিকে সবচেয়ে অস্থির রাত! সারাক্ষণ অজানা এক ধরনের টেনশন কাজ করে। কি করব আজ? আমাকে ওর ভাল লাগবে তো? কি বলে কথা শুরু করব? আমার কথা শুনে হাসবে নাতো? ইস যদি হাসে! কি লজ্জা!! তবে নিশাতের মনে লজ্জার পাশাপাশি শঙ্কাও কাজ করছিল -সব কিছু ওকে খুলে বলব, নাকি বলব না?

জাভেদ নিশাতের অন্ধকার মুখ দেখে বলল, কি মন খারাপ লাগছে? নিশাত কিছু বলছে না দেখে সে আবার বলল, স্বাভাবিক, ফ্যামিলি ছেড়ে তুমি এখানে এসেছ। তোমার মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। অবশ্য আমি তোমার পুরো ফিলিংসটা বুঝতে পারছি না কারণ আমার কাউকে ছেড়ে আসতে হয়নি। তবুও আমি তোমাকে বোঝার চেষ্টা করছি। যদিও আমি মনে হয় এখন একটু নার্ভাস। প্লিজ মন খারাপ কর না। ধীরে ধীরে সব সহ্য হয়ে যাবে।

স্বামীর মুখে এমন বন্ধুসুলভ কথা প্রত্যেকটি মেয়েই প্রত্যাশা করে। নিশাত ভাবল, জাভেদ তো বেশ ফ্রেন্ডলি! ও মনে হয় আমাকে বুঝবে। সবকিছু ওকে বলা উচিত। আমি কাউকে ঠকাতে চায় না।

নিশাত বলা শুরু করল, আমি আপনাকে কিছু বলতে চাচ্ছি।

- বল। কিন্তু আপনি করে কেন? এ যুগে হাজবেন্ড-ওয়াইফ কি আপনি-আপনি বলে?

- না, তা বলে না। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তো আমাদের অতীত জানি না। এটা বোধহয় আমাদের জানা উচিত।

- অতীত জেনে কি হবে? পাস্ট ইজ পাস্ট। আমাদের অতীত আর এমন কি? আমি ছিলাম রুয়েটের স্টুডেন্ট আর তুমি ছিলে রাবির। তুমি আমাকে চিনতে না। আমিও তোমাকে চিনতাম না। এই তো।

- হ্যাঁ সবই ঠিক আছে। তবে... মানে... কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না।

- বলতে হবে না। আমি বুঝে গেছি। তুমি কি অ্যাফেয়ার নিয়ে কিছু জানতে চাচ্ছ? আমার কোন অ্যাফেয়ার ছিল না। তবে প্রেম করার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কেউ পাত্তা দেয়নি। ফাটা কপাল তো! তা তোমার কেউ ছিল নাকি? থাকতেই পারে। এ যুগে আমার মত গবেটের সংখ্যা খুবই কম যারা একটা প্রেমও করতে পারে নি। তা ছিল নাকি কেউ? ইচ্ছা হলে বলতে পার। আমি অতীত নিয়ে মাথা ঘামাই না। জানো আমি ঠিক করেছিলাম তোমার কোন অতীত আমি জানতে চাইব না। তুমি কথা তুললে তাই বললাম।

কথাগুলো খুব প্রাঞ্জল ভাষাতেই বলল জাভেদ। একদম জড়তাহীন! যেন নিশাতের কাছ থেকে যেকোন কথা শোনার জন্যই সে প্রস্তুত। অতীত সম্পর্কের কথা শুনেও যেন সে কিছুই মনে করবে না।

কিন্তু নিশাত একটু অবাকই হল যখন সে দেখল, তার উত্তর শুনে জাভেদের চোখ কেমন যেন বিষন্ন হয়ে গেল,ভার্সিটি লাইফে আমার একটা অ্যাফেয়ার ছিল। আমরা এক সাথেই পড়তাম। ছেলেটার নাম ছিল...।

- থাক! বাদ দাও। আমি আর শুনতে চাই না। আগে ছিল। এখন তো নেই। অতীত অতীতই। ওটা নিয়ে ভাবার দরকার নেই। বর্তমানই আসল।

[তিন]

তিন মাস পর।

স্বামী হিসেবে জাভেদ অসাধারণ। ওর মনটা আসলেই অনেক বড়। মা ঠিকই বলেছিলেন - জাভেদ খুব ভাল ছেলে। আসলেই ও খুব ভাল। আমি ওকে ভীষণ ভালবাসি। আচ্ছা ও কি আমাকে ভালবাসে? অবশ্যই বাসে। তা না হলে আমাকে এত আদর করবে কেন? ভাবছে নিশাত। কিছুক্ষণ আগে জাভেদ অফিসে গেছে। নিশাত ঠিক করেছে আজ সে ওর বুকসেলফ গোছাবে। জাভেদের বইয়ের কালেকশন বিশাল। বঙ্কিম, শরৎ, রবি, নজরুল থেকে শুরু করে হালের হুমায়ূন পর্যন্ত -কি নেই সেখানে! বোঝাই যাচ্ছে জাভেদ ছিল বইয়ের পোকা। একেকটা বই মুছতে মুছতে নিশাত ঠিক করে এগুলো একটা একটা করে পড়তে হবে।

হঠাৎ সেলফে বইয়ের ফাঁকে সে একটা ডায়েরি দেখতে পায়। দেখে মনে হয় কেউ ওটা লুকিয়ে রেখেছে। কার ডায়েরি? এ দেখি জাভেদের নাম লেখা। কি লিখেছে ও? দেখব নাকি দেখব না? দ্বন্দ্বে পড়ে যায় নিশাত। অনুমতি ছাড়া তো কারোর ব্যক্তিগত ডায়েরি পড়া ঠিক না। আরে দুর! প্রয়োজন আইন মানে না। দেখি না কি লিখছে!

"... আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে নিশাতের একটা অ্যাফেয়ার ছিল। ও আমাকে এভাবে ঠকাল! ছি! আজকাল অ্যাফেয়ারের নামে কি সব করা হয় তা আমার ভালই জানা আছে। ওকে আমার ঘৃণা হয়। অসহ্য লাগে। আমি ভাবতে পারি না -যে ঠোঁট দিয়ে ও আমাকে আদর করে সেখানে হয়ত অন্য কারোর ছাপ রয়েছে...।"

নিশাত আর পড়তে পারে না। তার চোখ ঝাঁপসা হয়ে আসে। তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তার কণ্ঠ দিয়ে কোন স্বর বের হয় না।

কর্পোরেট সাউন্ড!

পেশাগত ধরনের জন্য আমাকে প্রায়ই নানান কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে যেতে হয়। আজকে বিকেলে গুলশানের তেমনই এক বহুজাতিক কোম্পানির কর্পোরেট হাউজে গিয়েছিলাম। আমার গন্তব্য ছিল ১৬ তলা। লিফটের কাছাকাছি এসে দেখলাম আরে ওটা ছেড়ে গেল বলে! এক দৌড়ে লিফটে উঠে মনে হল লিফটের অন্যান্য আরোহীরা আমার এ প্রবেশকে খুব একটা ভাল চোখে দেখল না।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল, আমি খুব সাধারণ পোশাকে চলাফেরা করি। আর এটাই আমার ভাল লাগে। অবশ্য এ জন্যে যে আমাকে মাঝে মধ্যে বিব্রত হতে হয় না তা নয়। কখনও কখনও আমার ড্রাইভারের জামা

কাপড়ও আমার থেকে ভাল হয় এটা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আজকে তো আমার ড্রেস আপ খুব একটা খারাপ না। তাহলে?

লিফটে আমি ছাড়া আর দুজন আরোহী ছিল। একটা মেয়ে। আর একটা ছেলে। বলতে দ্বিধা নেই, আমার মনে হচ্ছিল মেয়েটার কি যেন নেই নেই! পরে খেয়াল করে দেখলাম, নাহ! আছে... তার গলায় ওড়না আছে! নিজের চোখের আচরণে নিজেকে একটু একটু দুষ্টু মনে হচ্ছিল। পরে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আল হাজেনের একটা কথা মনে পড়ল -বস্তু থেকে আলো আমাদের চোখে আসলে আমরা ওই বস্তুটা দেখতে পাই। তাহলে আমার আর দোষ কি?

ছেলেটার চুল স্পাইক করা। ব্লেজারে সাথে অসম্ভব টাইট একটা নরমাল প্যান্ট পরা। নাহ তাকে আনস্মার্ট বলা যাবে না। মেয়েটা বলল, you are looking so cool dear!

- O really! Thanks. তোমার ড্রেসটাও সেই রকম! জোশ লাগছে তোমাকে!

ছেলেটার কথা শুনে মেয়েটা যেন গর্বে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। এমনিতেই তার ড্রেসটা যথেষ্ট টাইট ফিট! বেশি ফুললে কপালে তো বিপদই আছে!!!

মেয়েটা বলল, আমাদের নতুন বসটা কেমন যেন! কর্পোরেট হাউজে boss should be more smart and frank!

- hmm! You are so right. He is damn…bull shit! F…k!

- এই স্টুপিড টাইপের লোক কেন যে এখানে এসেছে! সে তো কর্পোরেট কালচারই বোঝে না! এত নরমাল ড্রেস আপ! So third class!

- hmm! Exactly! Look at me. Real corporate man! My attitude! My behave! I think all these reflect my corporate society!

- yah darling!

- Even when I walk, you can see corporate movement!

এ কথা বলে ছেলেটা লিফটের মাঝে একটু হাঁটার ভঙ্গি করতেই ফ-রা-ৎ করে একটা আওয়াজ হল। সাথে সাথে তার মুখটা যেন বাংলা পাঁচ হয়ে গেল। লিফট থেকে নামার সময় তাকে দেখলাম ব্লেজারটা দিয়ে সে তার পশ্চাদ্দেশ ঢাকার প্রাণপণ চেষ্টা করছে! What a corporate sound!!!

একটি সাধারণ গল্প

সকাল সকাল বাসা থেকে বের হচ্ছি দেখে ভাবী বললেন, ‘কি ব্যাপার! এত সাজুগুজু করে এত তাড়াতাড়ি আজ কোথায় যাওয়া হচ্ছে?’

‘এই তো এক ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করে আসি।’

আমার উত্তরে ভাবী যেন সন্তুষ্ট হলেন না। কেমন একটা রহস্যময় হাসি দিলেন। কাল মাঝরাতে যখন মোবাইলে কথা বলছিলাম ভাবী তা শুনে ফেললেন নাকি? আমি আর সময় নষ্ট না করে দ্রুত বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম।

এখন আমাকে অনেক দূর যেতে হবে -খিলগাঁও থেকে মিরপুর। ঢাকাতে আমি তেমন একটা আসি না। তাই অপরিচিত পরিবেশে কেমন যেন অসহায়বোধ করছিলাম। এত দূর কিভাবে যাব? কিন্তু যেতে যে আমাকে হবেই। আজ এগারটায় ওর সাথে দেখা করার কথা। মিরপুর শেওড়াপাড়া ওভারব্রিজের নীচে আসবে সে। তারপর... আপাতত জানি না।

খিলগাঁও থেকে ম্যাক্সি চড়ে মালিবাগ মোড়ে পৌঁছালাম। তারপর একটা বাসে উঠে বসলাম। এটা যাবে ফার্মগেট। আমি জানালার পাশে বসেছিলাম। এত মানুষ, এত ছুটোছুটি! কেমন যেন ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিল। ফার্মগেট এসে পড়লাম ঝামেলায়। এখন মিরপুর কিভাবে যাব -তা তো জানি না। শেষে এক পান বিক্রেতা বললেন, ‘১০ আর ১১ নম্বর বাসগুলো মিরপুর যায়।’

বাসে উঠে এবার আর বসার জায়গা পেলাম না। এক হাত দিয়ে মাথার উপরের হাতল ধরে রইলাম। অন্য হাতে পকেট শক্ত করে চেপে ধরলাম পাছে যদি পকেট কাটা যায়!

এবারের ড্রাইভার বেশ রসিক মানুষ মনে হল। সে গান বাজাচ্ছিল, ‘গুলশান, বনানী আবার জিগায়... তেজকুনিপাড়ায় হালায় আবার জিগায়...।’

শেওড়াপাড়া পৌঁছে দেখি ঘড়িতে পৌনে এগারটা বাজে। আরো এখনো পনের মিনিট বাকি। কি করা যায়? ওকে একটা ফোন দিলাম, হ্যালো সাদিয়া! আমি তো চলে এসেছি।

- চলে এসেছেন। কোথায় আপনি?

- এই তো তোমাদের বাসার গলির ভেতর হাঁটছি।

- কি? যান যেখানে দাঁড়ানোর কথা সেখানে গিয়ে দাঁড়ান। আমি পনের মিনিটের মধ্যে আসছি।

অজানা অচেনা জায়গায় কারো জন্য অপেক্ষা করাটা যে কতখানি বিরক্তিকর তা বলে বোঝানো যাবে না। কি করব বুঝতে পারছিলাম না। শেওড়াপাড়া বাজার থেকে হেঁটে ওভারব্রিজ পর্যন্ত এলাম। আবার উল্টো পথে গেলাম। একটু পরে সে এল। বাহ! গতবারের তুলনায় এবার সে অনেক সুন্দর হয়েছে। চুলও বড় হয়েছে।

- কি খবর? কেমন আছ?

- ভাল। আপনি?

- এই তো।

- তারপর কোথায় যাবেন?

- আমি কিভাবে বলব? আমি তো এখানকার তেমন কিছুই চিনি না। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই যাব।

এসব ঘটনায় সাধারণত ছেলেটা মেয়েটাকে পথ দেখায়। আমার ক্ষেত্রে ঘটল উল্টোটা। সাদিয়াই চালকের আসনে বসল।

আমরা মিরপুর বাঁধের উদ্দেশ্যে রিকশা নিলাম। রিকশার পেছন রিকশা। গাড়ির পেছন গাড়ি। হাজার মানুষের ছুটে চলার মাঝে আমদের রিকশাও এগিয়ে চলল। দুজনই চুপচাপ। হঠাৎ কেমন যেন সিনেম্যাটিক ডায়ালগ দিয়ে ফেললাম, তুমি না আগের চেয়ে সুন্দর হয়ে গেছ... অনেক সুন্দর!

- কি যে বলেন! মুখ পিমপলে ভরে গেল। আর আপনি বলেন সুন্দর!

সত্যি বলতে কি সেদিন ওকে আসলেই সুন্দর লাগছিল। বলতে দ্বিধা নেই ওর চোখ দুটো আমাকে যেন চুম্বকের মত টানছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুঁয়ে দেখি! আরেকটা জিনিস অনুভব করলাম। এর আগেরবার যখন ও আমার সাথে রিকশায় উঠেছিল তখন আমাদের মাঝে প্রায় পাঁচ ইঞ্চি দূরত্ব ছিল। অথচ আজ সেটা নেই।

মিরপুর বাঁধ আমার কাছে আজব জায়গা বলে মনে হল। শুধু জুটি আর জুটি। রিকশায় জুটি। রাস্তায় জুটি। পার্কে জুটি। হঠাৎ এক লোক এসে বলল, মামা ছইওয়ালা নৌকা আছে। আসেন আপুরে নিয়া নৌকাই ঘুইরা আসেন।

আমি বললাম, নৌকায় উঠবে?

সাদিয়া আমাকে এক বাক্যে না করে দিল।

আমরা বাঁধের উপর বসলাম। সামনে শুকনো নদী। নদীর পাড় ঘেষে ধানের চারা লাগানো হয়েছে। একটা ছোট কার্গোকে দেখলাম ঘুরে ঘুরে বালি তুলছে।

- তারপর কি অবস্থা? কি খবর? আমি বললাম।

- কি আর খবর হবে? প্রতিদিনই তো আপনার সাথে কথা হয়। সবই তো জানেন। নতুন কোন খবর নেই।

এরপর কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। আসলে এখানে আসার আগে মনে হয়েছিল ওকে সামনে পেলে কথার ঝড় বইয়ে দেব। অথচ এখন বলার মত কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। আমি বললাম, মোবাইলেই তোমার সাথে গল্প জমে। এখন কেমন যেন লাগছে।

- আচ্ছা ঠিক আছে। যান দূরে যেয়ে আমাকে কল দেন আমি রিসিভ করছি!

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি।

- আচ্ছা তুমি আমাকে আর কতদিন 'আপনি' করে বলবে? আমার এসব আপনি-টাপনি আর ভাল লাগছে না। প্লিজ 'তুমি' করে বল। প্লিজ।

- আচ্ছা বাবা বলব, বলব। পরে বলব। গান শুনবেন। নেন গান শুনেন।

সাদিয়া তার এমপিথ্রি প্লেয়ারের হেডফোনের একটা কর্ড আমার কানে ভরে দিল। অন্যটা নিজের কানে রেখে দিল। মাহামুদুজ্জামান বাবুর গান বাজছে, আমি বাংলার গান গাই...।

আস্তে আস্তে সূর্যের তাপ বাড়তে লাগল। এমনিতেই আমার মাথায় চুল কম। তারপর এমন খোলা জায়গায় সরাসরি সূর্যের আলো। মাথা ঝিমঝিম করা শুরু করল। ওর অবশ্য তেমন একটা লাগল না। কারণ আমাকে দিয়ে সূর্যকে আড়াল করে সে বসেছিল। বসুক। বেশিক্ষণ সূর্যের আলোয় থাকলে আমার হাত- পা কাঁপতে থাকে। যাক তারপরও ওকে আড়াল করে রাখারই চেষ্টা করলাম। কেননা আমি যে ওকে ভালবাসি, ভীষণ ভালবাসি।

হঠাৎ ওর হাত ধরলাম। এক ঝটকায় ও হাত ছাড়িয়ে নিল। একটু কষ্ট পেলাম। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, এটা ঠিক না। এটা ঠিক না।

কিন্তু পারলাম না। পরে যে কখন আবার ওর হাত ধরে ফেলেছিলাম তা নিজেই টের পাইনি। এভাবে কতক্ষণ যে ওর হাত ধরে ছিলাম তা বলতে পারব না।

দুপুর হয়ে এলে আমরা জায়গা পরিবর্তন করলাম। একটা পুকুরের পাশে গাছের নিচে ছায়ায় গিয়ে বসলাম।

সত্যি বলতে কি সারাদিন আমাদের তেমন একটা কথা হল না। শুধু চুপচাপ পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে বসে থাকা হল। বেশিরভাগ সময়ই আমি বেহায়ার মত ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ও প্রায়ই বলছিল, দ্যাখেন, এভাবে তাকিয়ে থাকবেন না। আমার ব্যাপারটা ভাল লাগে না।

কিন্তু আমি কি করব? আমি যে কিছুতেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। শুধু ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল। দূরে দেখলাম, আমাদের মত এক জোড়া বসে আছে। হঠাৎ ছেলেটা মেয়েটাকে জোর করে ধরে একটা কিস দিয়ে দিল। মেয়েটা রাগ করে উঠে গেল। ছেলেটা 'সরি, সরি' বলতে বলতে তার পেছন পেছন ছুটল।

আজকের দিন আমার কাছে বছরের সবচেয়ে ছোট দিন বলে মনে হচ্ছিল। এত তাড়াতাড়ি বিকাল হয়ে গেল! ইচ্ছে হচ্ছিল না ফিরে যাই। তবুও ফিরতে হল। সাদিয়া রিকশা নিয়ে বাসায় চলে গেল। আমি শেওড়াপাড়া বাজারের সামনে নেমে গেলাম। আবার সেই ফেরার পালা, আবার সেই বাস, 'গুলশান, বনানী আবার জিগায়... তেজকুনিপাড়ায় হালায় আবার জিগায়...।'

তিশার বাসর!

তিশা কখনোই ভাবেনি যে তার জীবনটাতে এমনটা হবে! কেমন যেন স্বপ্নের মত লাগছে সব কিছু! এত হুটহাট মানুষের জীবনে পরিবর্তন হয়! এখনও তিশার মনে হচ্ছে সে হয়ত নানির পানের সাথে লুকিয়ে কাঁচা সুপারি খেয়ে ঘোরের মধ্যে আছে! নিজেকে সে একটা চিমটি কাটে। উহ! ব্যথা পেলাম তো! তার মানে সবই ঠিক আছে। সবই সত্য!

কিছুক্ষণ আগে তার বিয়ে হয়েছে। পাত্রপক্ষ সন্ধ্যাবেলা দেখতে আসল। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। সে শুধু শুনেছে ছেলে নাকি সোনার টুকরা! ভাল চাকরি করে! ঘুষ না খেয়েই ভাল বেতন পায়। ছেলে তাকে পছন্দ করেছে। আর এতেই বাবা আনন্দে আত্মহারা! হঠাৎ বাবা এসে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মা। আমরা চাই তোর এখানে বিয়ে হোক। তোর কি আপত্তি আছে?

তিশা কি বলবে প্রথমটায় বুঝতে পারছিল না। পরে ভাবল বিয়ে তো করতেই হবে। তাছাড়া পাত্রের চেহারা তার অপছন্দ হয়নি। তাই সে হ্যাঁ- বোধক মাথা নাড়িয়ে দিল!

কিন্তু তখন তার মনে তেমন কোন জটিল চিন্তা না আসলেও এখন চরম অস্বস্তিতে তার মাথা ঘুরাচ্ছে! লাল একটা শাড়ি পরে সে বিছানায় চুপচাপ বসে আছে। একটু পরে তমাল (পাত্রের নাম) আসবে। বিষয়টা তিশা এখনো মেনে নিতে পারছে না। চেনে না-জানে না এমন একটা লোকের সাথে তাকে একই ছাদের নিচে থাকে হবে! আচ্ছা তমাল এসে কি করবে! হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়বে নাতো! ইস এসব আমি কি ভাবছি!!

তিশার ভাবনা অদ্ভুত থেকে অদ্ভুতুড়ে পর্যায়ে যেতে থাকে!

সমপূর্ণ অপরিচিত একজন মানুষের সাথে কিভাবে আমি থাকব? একই ছাদ... একই বিছানা... এ মা কাঁথাও তো একটাই...।

একটু পর তমাল আসল। দরজা বন্ধ করার সাথে সাথে তিশার বুকটা কেঁপে উঠল। সে চোখ বন্ধ করে রইল। কিন্তু তার কান সম্পূর্ণ সজাগ! সে সপষ্ট শুনতে পাচ্ছে তমাল হেঁটে হেঁটে খাটের কোণায় এসে পৌঁছেছে!

হঠাৎ তিশার মনে হল কেউ বোধহয় তার শাড়ির আঁচল ধরে টানছে। শিট! এসেই শুরু করল! এ তো দেখছি চরম অসভ্যলোকরে বাবা! পরক্ষণেই তিশা চোখ মেলে দেখল তার শাড়ি ধরে কেউ টানেনি। আঁচলের এক অংশ খাটের মশারি স্ট্যান্ডের সাথে আটকে গিয়েছিল। আর তমাল তার সামনে বসে আছে। সে তিশাকে অবাক করে দিয়ে বলল, তোমার চোখ দুটো তো অনেক সুন্দর!

হারমাফ্রোডাইট

নতুন মোবাইল কিনেছে জাভেদ। নতুন নতুন সেট নিলে উঠতি তরুণদের যা হয় তারও তা-ই হল -কাজ না থাকলেই জানা-অজানা নম্বরে মিসকল দেয়া। কেউ কেউ কলব্যাক করে, কেউ বা করে না। মাঝে মধ্যে দু'একজন ঝাড়িও দেয়, 'ওই ব্যাটা মিসকল দিস ক্যান?'

প্রথম প্রথম জাভেদ ঝাড়ির জবাব দিতে পারত না -সরি,ভুল হয়েছে ইত্যাদি বলত। এখন পাল্টা জবাব দেয়, 'ভাই ইচ্ছের কেজি লাখ টাকা! ইচ্ছে হল তাই দিলাম। মিসকল পেলেই কলব্যাক করতে হবে এমনকি কোন কথা আছে? নাকি ভাই ভাবছিলেন কোন মেয়ের মিসকল! মেয়েদের সাথে কথা বলার এত শখ ক্যান?' উল্টো ঝাড়ির সময় যত বাড়াতে পারে জাভেদের ততই আনন্দ- বাহ ব্যাটার অনেক টাকা খাইলাম!

আজকে জাভেদ নতুন প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে -এক একটা অপরিচিত নম্বরে মিসকল দিতেই থাকবে যতক্ষণ না সেটা থেকে কেউ কলব্যাক করে। কোন কিছু চিন্তা না করেই জাভেদ মোবাইল বাটন টেপা শুরু করল, ০১৭০৮৬৭০৯...। এই তো রিং হচ্ছে। একবার, দুবার,তিনবার - টানা মিসকল দিল। কিন্তু কোন সাড়া নেই। আরেকবার দেই। এবার ব্যাটা বিরক্ত না হয়ে পারবে না। আশ্চর্য! ঘুমাচ্ছে নাকি? কিন্তু এই সন্ধ্যাবেলায় কেউ কি ঘুমায়? দাঁড়া! দেখাচ্ছি মজা! তুমি ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখেছ কিন্তু জাভেদ দেখো নাই! টানা ৩২ বার মিসকল দিল সে। ইয়েস! এবার কলব্যাক করেছে। তাও আবার নারীকণ্ঠ!

- হ্যালো, মিসকল দিচ্ছেন কেন?

- ইচ্ছে হল তাই দিলাম।

- ও তাই। বুঝতে পেরেছি নতুন সেট নিয়েছেন, তাই না?

- হাঁ। কিন্তু কি করে বুঝলেন?

- এটা না বোঝার কি আছে? একসময় আমারও তো আপনার মত বয়স ছিল। তা কোন ক্লাসে পড়েন? ফার্স্ট ইয়ার?

খাইছে! বয়স্ক কোন আন্টির সাথে ফাজলামি করে ফেললাম নাকি? জাভেদ মিথ্যা বলল না, হ্যাঁ। অনার্স ফার্স্ট ইয়ার।

- কোন সাবজেক্ট?

- ইকোনমিক্স।

- ভেরি গুড। কোন ভার্সিটি?

- ঢাকা ভার্সিটি।

- ও তাই। আমিও তো ওখান থেকেই পাশ করেছি।

- তাই নাকি! কবে?

- এই তো ২০০৪ এ।

- আপনি আমার ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র। সরি। সরি। আপু। আমার ভুল হয়ে গেছে।

- না ঠিক আছে। তা তোমার নাম কি?

- জাভেদ।

- দেশের বাড়ি কোথায়?

- বরিশাল।

- বরিশাইল্যা! আমার শ্বশুড়বাড়িও ওখানে। জানো তোমার ভাইকে আমি কি বলে ক্ষেপাই - বরিশাইল্যা মুরগি চোর/ ব্যাড়া ভাইঙ্গা দিল দৌড়! রাগ করলে নাকি?

- না না। ব্যাপার না। আপু তা ভাইয়া কি করেন?

- কি আর করবে! রাস্তা সাফ করতে পারে। দোকানদারিও করতে পারে।

- মানে?

- মানে ও সাউথ আফ্রিকা থাকে। কি করে তা আমি জানি না।

- আপনি এখানে একা থাকেন?

- না। আমি আর আমার বাবুটা গলাগলি বেঁধে থাকি।

- বাবুটার নাম কি?

- তানিম।

- কোন ক্লাসে পড়ে?

- পড়ে না।

- খুব ছোট। তাই না?

- এই তো পাঁচ বছর হতে চলল।

- এখনো স্কুলে দেননি! এ বয়সে তো বাচ্চারা প্লে-গ্রুপ শেষ করে ফেলে।

- কিন্তু আমার বাবুটা কোনদিন পড়তে পারবে না। কোনদিনও না। কি হবে ওর পড়াশুনা করে? কেউ তো ওকে কোনদিন ভালবাসবে না। কোনদিনও না। সবাই শুধু হাসবে। আর হাসবে। বড় হলেও তো হাসির পাত্র হবে। ওর পড়াশুনা করে কি হবে?

কি ব্যাপার! আপুর কণ্ঠ ভেজা মনে হচ্ছে। জাভেদ কিছুটা থতমত খেয়ে গেল, সরি আপু। সরি। আমি আসলে কিছুই বুঝতে পারছি না।

- পারবে কি করে? তুমি তো কিছুই জান না। জান আমি না জীবনে কোন পাপ করিনি। তাহলে আল্লাহ আমাকে কেন এমন শাস্তি দিলেন? কেন?

জাভেদ কি বলবে কিছু বুঝতে পারছে না। তাই সে চুপ করে রইল। একটু থেমে আপু আবার বলল, তুমি আমার কথায় কিছু মনে কর না। আসলে তোমাকে কেন এসব বলছি তা আমি জানি না। তুমি আমার ডিপার্টমেন্টের ছোট ভাই। তাই হয়ত বলছি। আসলে আমার কষ্টগুলো কারও সাথে শেয়ার করা দরকার। আর তোমার ভাইও যেন কেমন হয়ে গেছে। যেদিন ডাক্তার বলল তানিম আর ভাল হবে না সেদিন থেকে ও কেমন যেন দূরে চলে গেছে। ভাল করে আমার সাথে কথা বলে না। আর তানিমের তো খোঁজই নেয় না। জান একবার ও কি বলেছিল- বাবুকে ওর মত লোকদের হাতে তুলে দিতে। ওদের নাকি নিজস্ব থাকার জায়গা আছে। সেখানে নাকি ও ভাল থাকবে। আর আমরা নতুন বাবু নেব। বল এটা কি সম্ভব? বাবুকে ছাড়া আমি বাঁচব কি করে?

- বুঝতে পারছি আপু আপনি খুব কষ্টে আছেন। সরি আপু। আমার খুব খারাপ লাগছে। আচ্ছা আপু আমি কি জানতে পারি তানিমের অসুখটা কি?

- হাঁ পারো। He is hermaphrodite.

- মানে?

আর কোন কথা শোনা গেল না। ওপাশ থেকে লাইন কেটে দেয়া হল। কিন্তু Hermaphrodite মানে কি? জাভেদ তাড়াতাড়ি ডিকশনারির পাতা উল্টাতে লাগল। শব্দটার মানে দেখে জাভেদের খুব খারাপ লাগল। হাঁ আপু, আমরা ওদের রাস্তায় প্রায়ই দেখি। ওদের নিয়ে হাসাহাসিও করি। কিন্তু একবারও ওদের নিয়ে ভাবি না। ওদের কষ্ট ওদেরই থেকে যায়। আর আমরা শুধু উপহাসই করি। কেননা আমরা যে মানুষ!!!

পরদিন।

জাভেদ আবার মোবাইলটা হাতে নিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল -থাক আর অযথা কাউকে মিসকল দেব না।

গ্রহণের কাল

[এক]

- ওই ছেমড়ি বসের সামনে গেলে কি তোর মাথা ঠিক থাকে না! ওড়না গলায় উঠে যায় কেন? তিশার ঝাঁজাল কথায় একটু নড়েচড়ে বসে লোপা। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে একসময়ের ভার্সিটির বান্ধবী আর আজকের কলিগ তিশাকে বলে, উহ! আর বলিস না। হি ইজ আওসম ম্যান! দৃষ্টিটা কি ম্যানলি দেখেছিস! আমার মাথা ঠিক থাকে না!!!

- আমি কিন্তু মোটেই ফান করছি না! সিরিয়াসলি বলছি। জানিস মিটিং- এর সারাটা সময় ওই শালা তোর কোন দিকে তাকিয়ে ছিল!

- কোন দিকে বল না? বল না প্লিজ!

- ছেমড়ি তুই আসলেই একটা ছাগল! কালকে থেকে যদি এত টাইট ড্রেস পরে অফিসে আসিস। তাহলে তোর খবর আছে।

- কি করবি তুই?

- কসম খোদার সব টেনে ছিঁড়ে দেব!

- হাহাহা...

[দুই]

হঠাৎ করেই রাফির সাথে ব্রেক আপ হয়ে গেল লোপার। রাফি আসলে তার মত নয়। শুধু গাইড করতে চায়। কত বড় সাহস ওর! বলে কি না আমি উশৃঙ্খল! আমি কি ওর চেয়ে কোন অংশে কম বুঝি! আমি একটা কর্পোরেট হাউজে জব করি। আমাকে জ্ঞান দিতে আসে!! যা ব্যাটা তোকে আমার দরকার নাই। আমার লাইফ আমিই ভাল বুঝব।

[তিন]

মাস খানেক পর। হঠাৎ একদিন।

লোপার মোবাইল বন্ধ। অফিসে আসার পর সবাই তিশাকে লোপার কথা জিজ্ঞেস করছে। কিন্তু তিশা তো কিছুই জানে না। সারাদিনে লোপার কোন খবর মেলে না। অফিস শেষে তিশা লোপাদের বাসায় যায়। যা জানতে পারে তা হল...

গতকাল রাত সাড়ে বারটায় বসের ফোন পেয়ে লোপা খুব অবাক হয়েছিল।

- হ্যালো।

- সরি ডিয়ার এত রাতে তোমাকে ডিস্টার্ব করলাম না তো।

- না ভাইয়া। সমস্যা নেই; বলেন।

- স্মার্ট গার্ল। দ্যাটস হোয়াই আই লাইক ইউ সো ম্যাচ! আসলে কি জান আমি মনে করি তোমার মাঝে অনেক সম্ভবনা আছে। তোমার আপ্রচ রিয়েলি অ্যাটট্রাকটিভ।

- থ্যাংকস ভাইয়া।

- আমি আসলে তোমাকে নিয়ে অনেক কিছু চিন্তা করেছি। আমি তোমার ট্যালেন্টকে অনেক রেসপেক্ট করি।

- থ্যাংকস ভাইয়া।

- দ্যাখ এই কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে কিন্তু সবাই উপরে ওঠে না। কিন্তু কেউ কেউ ওঠে। আমি জানি তুমি সেটা পারবে। লেটস বি মোর ফ্রাঙ্ক হানি! তোমাকে আরও ফাস্ট হতে হবে। অনেক স্ট্রেট ফরোয়ার্ড হতে হবে।

- থ্যাংকস ভাইয়া। আমি চেষ্টা করব।

- লিসেন। আমি কিন্তু স্ট্রেট কথার মানুষ।

- জী।

- শোন তোমাকে আমার অনেক ভাল লাগে। আমি তোমার সাথে কয়েকদিন একসাথে কাটাতে চাই।

- কি বলতে চান?

- ভেবে দ্যাখ! তোমার স্যালারি, প্রোমোশন সবই আমি দেখব। তোমার ভাবি কয়েকদিন বাসায় নেই। লেটস হাভ ফান।

লোপা ফোনটা বন্ধ করে দেয় আর অন করে না।

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা

[এক]

- আহারে...

- পোলাডা কত ভাল ছিল!

- ছাত্র হিসেবেও ছিল অসাধারণ। ইন্টারে স্ট্যান্ড করেছিল।

- আহারে...

- আর কয়টা দিন পরই তো পাশ করত।

- কিন্তু ও...

বাড়িময় লোকজন। বাতাসে আগরবাতির গন্ধ।

উঠোনে এলাকার মুরুব্বিরা চেয়ার পেতে বসে আছে। রাস্তায় পার্ক করা পুলিশের জিপে বসে হাবিলদারটা আপনমনে বিড়ি টানছে। এলাকার মসজিদ থেকে এই মাত্র খাটিয়াটা আনা হয়েছে। কাফনের কাপড় আনতে লোক পাঠানো হয়েছে।

বাড়ির ভেতর থেকে উচ্চস্বরে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে -বাবারে তুই আমাদের এভাবে ছেড়ে গেলি... আমরা এখন কি নিয়ে বাঁচব সোনা... !

- আপনারা কি শিওর যে এটা সুইসাইড?

- পোস্টমর্টেম করলেই বোঝা যাবে।

- আর পোস্টমর্টেম কইরাই বা কি হইব? ওরে তো আর ফেরত পাওয়া যাইবো না।

ঠিকই তো! শামীমকে তো আমরা আর কখনোই দেখব না। কি লাভ পোস্টমর্টেমে!

[দুই]

শামীম আমার খুব ভাল বন্ধু ছিল। বলতে গেলে সারাক্ষণই আমরা একসাথে থাকতাম। লেখাপড়া, ঘোরাফেরা- কখনো আলাদাভাবে করেছি - এমনটা আমার মনে পড়ে না। আমরা আমাদের ফিলিংসগুলো শেয়ার করতাম। জানতাম ওর সাথে একটা মেয়ের অ্যাফেয়ার আছে। শামীম আমাকে প্রায়ই বলত, 'দোস্ত আমার জীবনটা সার্থক! আমি অর্চির ভালবাসা পেয়েছি। আমি ওকে খুব ভালবাসি।' ওর কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগত। মাঝে মধ্যে হিংসাও হত, 'ইস আমার জীবনে কেন প্রেম আসে না!'

শামীম আমাদের মাঝে নেই আজ প্রায় দু'মাস হতে চলল। এখনো কেউ জানে না কেন সে এমন কাজ করল। ক'দিন আগে আমিও জানতাম না। কিন্তু এখন জানি। বিচিত্র মানুষের মন। বিচিত্র তার অনুভূতি এবং খুবই বিচিত্র তার প্রকাশ। শামীমের ডায়েরিটা কয়েকদিন আগে হাতে পেয়েছি। মাঝে একটা পৃষ্ঠার অর্ধেকটা ছেঁড়া,তারিখ লেখা নেই -

'...ও আমার সাথে কেন এমন করল? আমি তো ওর কোন ক্ষতি করিনি। তবে কেন ও আমাকে এভাবে শেষ করে দিল! কি করিনি আমি ওর জন্য! ওর জন্য আমি আমার মায়ের সাথে মিথ্যা বলেছি পর্যন্ত। বাবার মুখে মুখে তর্কও করেছি। আর ও...। কত বিশ্বাস করেছিলাম ওকে... কত ভালবাসতাম... নিজেকেও বোধহয় আমি এতটা ভালোবাসিনি। আমার সাথে ওর সব কথা, সব অনুভূতি -সবই ছিল খেলা। আমি কেন এত বোকা! সততার কি কোন দাম নেই! আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, ভীষণ কষ্ট! ও আমাকে ভালবাসে না -এ জন্যে আমার কোন কষ্ট নেই। কেবল কষ্ট লাগে তখনই যখন ভাবি,এমন একটা ফালতু মেয়েকে আমি বলেছিলাম -আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি এখন কি করব! বিধাতা তুমি ওকে কোনদিন ক্ষমা কর না... কোনদিনও না। কিন্তু আমি... আমি...।'

এরপরও কি যেন লিখেছিল শামীম। হয়ত পরে আবার কি মনে করে নিজেই ছিঁড়ে ফেলেছিল - কে জানে!

মহালয়া

[এক]

জয়ের মাথা আজকে প্রচণ্ড গরম। অসম্ভব রকম খিঁচড়ে আছে তার মেজাজ। সবকিছু তার ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে... একবার, মাত্র একবার যদি ওকে হাতের কাছে পেতাম ছিঁড়ে-খুঁড়ে একদম ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়ে দিতাম! এত বড় সাহস ওর! জয়কে ফিরিয়ে দেয়! দেখা যাবে কোন চাঁদ ওকে বিয়ে করতে আসে! জয় পূজামন্ডপের দিকে এলোমেলোভাবে হেঁটে যেতে থাকে।

ঘড়িতে রাত সাড়ে ১১টা বাজে। আজ বিজয়া দশমী। একটু পরে প্রতিমা বিসর্জন হবে। মাইকে পুরোহিত জোরে জোরে মন্ত্র পড়ছেন।

মন্ডপ থেকে ঢাকের বাড়ি তন্দ্রার কাছে এসে পৌঁছায়। তার ঘুম আসে না। অদ্ভুত এক ভয়, আতঙ্ক যেন তাকে জাপটে ধরেছে। যদিও আজ সে একটা বিরাট সাহসের কাজ করেছে। দিয়েছে হাতের পাঁচ আঙুলের ছাপ বদমাশটার গালে বসিয়ে। বেয়াদপ, বখাটে একটা... বলে কি না তাকে ভালোবাসে! ওর মতো অশিক্ষিত ছেলে তার হাত ধরার সাহস পায় কোত্থেকে, এটা ভেবে তন্দ্রা প্রচণ্ড অবাক হয়। নাহ, আর জেগে থাকা যাবে না। ঘুমানো দরকার। কালকে তাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। ছেলে একটা মুঠোফোন কোম্পানিতে ভালো চাকরি করে। তন্দ্রা ছেলেটার ছবি দেখেছে। দেখতে সে ভালোই। নিজের অজান্তেই মুচকি হাসে তন্দ্রা।

এদিকে মন্ডপের পেছন দিকের বড় মাঠের মাঝখানে আজ যেন অসুরের অপচ্ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভর করেছে ওদের ওপর!

ওহ,জয়! তুই জিনিয়াস।

আহ, খাসা মাল একটা... জয়,আমাকে একটু ভাগ দিস।

দে, আমাকে দে। আমি ব্লুটুথ অন করেছি।

বাংলা মদের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি অশ্লীল খিস্তিখেউড় যেন এর উৎকটতা বাড়িয়ে দিয়েছে আরও কয়েক গুণ। নেশায় বুঁদ হওয়া জয় তার মোবাইল দিয়ে এমএমএস এদিক-ওদিক পাঠাতে থাকে... দে আমাকে আরও নম্বর দে। আমি শালির বিয়ে আজই করাইয়া দিমু!

পাশাপাশি বাড়ি। তন্দ্রাদের বাসার বাথরুম যে জয়ের রুম থেকে তেমন দূরে ছিল না -এটা যদি কেউ আগে খেয়াল করত, তাহলে এমনটা হতো না। আর কাজটা যে জয়ই করেছে, তাও তেমন কেউ জানল না। সবাই জানল,তন্দ্রা আত্মহত্যা করেছে।

আহারে... মেয়েটা... আহারে!

[দুই]

দশ বছর পর।

বিয়ের পর এবারই প্রথম পূজায় শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসেছে জয়। প্রতিদিন মাছ, মাংস, দুধ, দই খেয়ে খেয়ে এ দুদিনে তার ওজন যেন ১০ কেজি বেড়ে গেছে। আর বউটাও হয়েছে তার এমন -পারলে যেন সারাক্ষণ তাকে জড়িয়ে থাকে। এ জন্যই তার তাপসীকে এত ভালো লাগে। এখানকার লোকগুলোও বেশ মিশুক। এলাকার অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয় হয়েছে। অনেক শালা-সম্বন্ধীও জুটে গেছে। ভালোই কাটছে সময়।

রাত ১০টার দিকে জয়কে ঘরের দরজা খুলতে দেখে তাপসী বলল, কোথায় যাচ্ছ?

এই তো মন্ডপে। প্রতিমা বিসর্জন দেখে আসি।

চলো, আমিও যাব।

না, না থাক। সারাদিন অনেক খাটাখাটি করেছ। এখন রেস্ট নাও।

মন্দিরে- মন্ডপে যেন লোক গিজগিজ করছে। জয় হাঁটতে গিয়ে মানুষের ঠেলা-গুঁতা কম খাচ্ছে না, তবুও তার মনটা খুব ভালো লাগছে। অনেক দিন পর আবার সে আজ দেবী প্রতিমার বিসর্জন দেখবে।

আ-রে, জামাইবাবু যে!

জয়কে দেখেই হাত বাড়িয়ে দিল তাপসীর এক পাড়াত ভাই রাম। সব খবর ভালো তো!

হ্যাঁ ভালো।

আপনি এসেছেন, খুব ভালো হয়েছে। একসঙ্গে আমরা মাকে আজ বিদায় দেব। জামাইবাবু, আপনার একটা ভিজিটিং কার্ড দেন তো। আমি মাঝেমধ্যেই আপনার এলাকায় যাই। তখন দেখা করে আসব।

কার্ডটা নিয়ে রাম ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

রাত বাড়ছে। ঢাকের শব্দ বাড়ছে। লোকজন সবাই মন্ডপের সামনে জড়ো হচ্ছে। হঠাৎ জয়ের মোবাইল ফোনটা কেঁপে উঠল।

এমএমএস। হায় ভগবান! এটা কী! ওহ সিট! তাপসীর সঙ্গে রাম এসব কী করছে! জয় আর দেখতে পারে না। সে উদ্ভ্রান্তের মতো মানুষের ধাক্কা খেতে থাকে। জোরে জোরে ঢাকের ওপর বাড়ি পড়তে থাকে।

জয় যেন কিছুই শুনতে পায় না... ঢাকের শব্দ... মানুষের চিৎকার... পুরোহিতের উচ্চারণ -যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা / নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ... নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।

হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন

ইদানিং বিকেলবেলা রাজিব বেশ একা হয়ে পড়ে। আশেক, সারোয়ার কাউকেই এখন আর পাওয়া যায় না। সবাই ভীষণ ব্যস্ত। এই কিছুদিন আগেও ওরা তিনজন একসাথে ঘুরত। বিকেলটা ভার্সিটির মেয়েদের দেখে, চা খেয়ে ভালোই কাটত। হঠাৎ করেই সারোয়ার একটা টিউশনি পেয়ে গেল। আশেকও একসময় ওর পথ ধরল। প্রতি বিকেলে তাই এখন ওদের আর দেখা পাওয়া যায় না। রাজিবের কিছুই হয়নি। সে না করে প্রেম, না করে টিউশনি। পেপার পড়ে, মোবাইল টিপে কতটাই বা সময় কাটে! তাই আগে যে বিকেলকে তার মনে হত 'এই এলো, এই গেল' টাইপের, এখন মনে হয়, কেউ বোধহয় অযথাই এ সময়টাকে চুইংগামের মত টেনে বড় করে ফেলেছে!

- কিরে কি করস? চল ঘুইরা আসি। হঠাৎ বিকেলবেলা রাজিবের রুমে এসে হাজির আশেক।

- তুই এ সময়! আজ তোর টিউশনি নাই?

- না। ছাত্রের শরীর খারাপ। তাই ওরও ছুটি, আমারও ছুটি। তা তোর রুমমেট কই?

- কে? ও রাসেল। ব্যাটায় হুজুর টাইপের পোলা। কই আর যাইব! নামাজ পড়তে গেছে হয়ত।

- ও। চল মোগলাই খাইয়া আসি।

- ক্যান তুই খাওয়াবি নাকি? নাকি আইজও আমেরিকান ওয়ে -যার যার তার তার?

- আরে না! ঐসব আমেরিকা-টামেরিকার কোন বেল আছে? আমিই খাওয়ামু।

- কী মামু! আজ খুব গরম মনে হয়! টিউশনির টাকা পাইস নাকি?

- এত বগর বগর করস ক্যান? চল না। আশেকের চোখ-মুখে হাসির ঝিলিক।

- বুঝছি। তাইলে মোগলাইয়ে হবে না। চল স্যুপ খাইয়া আসি।

- ধ্যাত শালা। তোর কোথাও যাওয়া লাগবে না। বিরক্ত আশেক।

খাইছে! স্যুপ-মোগলাই মনে হয় সবই গেল! রাজিব তাড়াতাড়ি বলল, ঠিক আছে দোস্ত। তুই যা বলবি তা-ই হবে। আসলে নাই মামার চাইতে কানা মামাই ভাল, তাই না-রে?

- কি?... ও হ্যাঁ... ঠিক। আশেকের চেহারায় তৃপ্তির প্রত্যাশিত এক অনুভূতি। একটু পর দু'জনে রিকশায় উঠল। গন্তব্য কোন ভাল হোটেল। ব্যস্ত শহরে যে যার মত ছুটছে আর ছুটছে। রিকশার পিছনে রিকশা। গাড়ির পিছন গাড়ি। পুরুষের পিছন নারী। নারীর পিছন পুরুষ। শুধুই ছোটাছুটি। হঠাৎ রাজিব বলল, দোস্ত দ্যাখ জিনিসটা হেভি না?

বিপরীত দিক থেকে রিকশায় একটা মেয়ে আসছে।

- হ খারাপ না, চলে। বলল আশেক। দূর থেকে মেয়েটাকে ভাল করে না দেখেই আশেক এ মন্তব্য করল। কিন্তু মেয়েটা কাছে আসতেই ও যেন লাফিয়ে উঠল। দোস্ত টোন করিস না। এইটা আমার ছাত্রের বড় বোন।

- ও তাই নাকি? তা মামা এর সাথে কিছু হয় টয় নাকি?

- দুর শালা। ওর সাথে আমার কথাই হয় নাই।

- কোন ক্লাসে পড়ে?

- ক্লাস মানে? আমাগো চাইতে দুই বছরের ছোট। অনার্স ফার্স্ট ইয়ার। একটু থেমে আশেক আবার বলল, একবার ওই মেয়েরে নিয়া একটা মজার ঘটনা ঘটছিল।

- কি ঘটছিল? ক' না শালা!

- একদিন আমি ছাত্ররে পড়াইতেছিলাম। ছাত্ররে আমি ওদের ড্রইংরুমে পড়াই। ওই মেয়েটা আশেপাশে ঘুরঘুর করতে ছিল। টেরাইয়া টেরাইয়া দেখতে ছিলাম। হঠাৎ শুনি ও বলল, স্লামালাইকুম। আমি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম,ওয়ালাইকুম আসসালাম। এরপর ভাল করে তাকাইয়া দেখি ওই মেয়ে আমারে সালাম দেই নাই। মোবাইলে অন্য একজনরে দিছে। কী যে লজ্জা লাগল। ছাত্রের দিকে তাকাইয়া দেখলাম বিচ্ছুটায় হাসতাছে।

- হা হা হা। রাজিব কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারছিল না। দোস্ত টিউশনিতে তো বেশ মজা। তবে আমার মনে হয় ছাত্রর চাইতে ছাত্রী পড়াইয়া আরাম বেশি।

- হ আরাম তো হইবোই... যদি লাইগা যায়... রাজকন্যা প্লাস রাজত্ব!

হঠাৎ কে যেন বলে উঠল, ওই রাজিব্বা কল ধর! ওই রাজিব্বা কল ধর! রাজিব তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মোবাইল বের করল। আশেক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, এইটা আবার কেমন রিংটোন?

- এক্সক্লুসিভ টোন! দাঁড়া কলটা ধইরা নিই। রাজিব কল রিসিভ করে।

- হ্যাঁ ভাই বলেন... আচ্ছা ঠিক আছে... আমি এখনই আসতাছি। লাইন কেটে দিয়ে রাজিব বলল, দোস্ত, মিন্টু ভাই কল দিসে। এখনই যাইতে হইব। চল।

ড্রইংরুম। শীতকাল বলে ফ্যান ঘুরছিল না। রুমের একপাশের সোফায় বসে আছে রাজিব আর আশেক, অন্যপাশে মিন্টু ভাই। তিনি রাজিবকে বললেন, এটা আমার বোনের বাড়ি। এখানেই তোমাকে পড়াতে হবে। তোমার স্টুডেন্ট ইন্টার-ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। একটু চঞ্চল প্রকৃতির। তোমাকে ধৈর্য সহকারে পড়াতে হবে। পারবে তো?

- জি ভাইয়া, পারব।

- আচ্ছা তোমরা বসো। আমি একটু আসছি। মিন্টু ভাই বাসার ভিতরে যেতেই আশেক বলল, দোস্ত স্টুডেন্টটা কি পোলা না মাইয়া?

- জানি না তো! পোলাই হবে হয়ত। মেয়ে স্টুডেন্ট কি আর আমার ভাগ্যে আছে? রাজিব যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

ভিতর থেকে এক কিশোরকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখে আশেক বলল, এটাই মনে হয় তোর স্টুডেন্ট।

- হবে হয়ত।

একটু পর সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটল। মিন্টু ভাই বললেন, রাজিব, এ হচ্ছে তোমার স্টুডেন্ট।

- ও আচ্ছা। তোমার নাম কি?

- লুসি।

কয়েকদিনের মধ্যেই রাজিবের ছাত্রী পড়ানোর সাধ মিটে গেল। ছাত্রী তার কোন কথাই শুনতে চায় না। রাজিব যদি বলে, ডানে যাও। সে যেতে চায় বাঁয়ে। যদি বলে, এটা লেখো। সে বলে, না স্যার পড়ি। রাজিব দু'একবার লুসির পরীক্ষাও নিতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। পারবে কি করে? যে পড়তেই চায় না, তার কাছে পরীক্ষা দেয়াটা তো ফোর্থ সাবজেক্টের মত গুরুত্বহীন!

একদিন পড়াতে বসে রাজিব বলল, আচ্ছা লুসি, তোমার কোন সাবজেক্ট পড়তে সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে?

- স্যার, আমার কিছুই পড়তে ভাল লাগে না।

- কেন?

- জানি না, স্যার।

- আচ্ছা তুমি কি আমার পড়ানো বোঝ না?

- বুঝি স্যার।

- তাহলে পড় না কেন?

- বললাম না স্যার, ভাল লাগে না, তাই।

- তাহলে কি করা যায় বল তো?

- জানি না, স্যার।

- আচ্ছা তুমি সারাদিন কি কর?

- কি করি মানে?

- মানে পড়াশুনা কর না। তো সময় কাটাও কি করে?

- কিছুই করি না স্যার।

- ভারি সমস্যায় পড়লাম তো! আচ্ছা আমার কি করতে হবে বলো? তোমার সাথে কি করলে তুমি পড়বে? তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

- না, না স্যার। আমার সাথে আপনার কিছুই করতে হবে না।

ঘড়িতে এখন রাত বারটা বাজে। বেশ শীত পড়েছে। তবে তেমন কুয়াশা পড়েনি। এসময় সারক্ষণই লেপের মধ্যে ঢুকে থাকতে ইচ্ছে করে। রাজিব লেপের মধ্যে শুয়ে পড়ছিল। ওর রুমমেট রাসেল ইতোমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ শোনা গেল, ওই রাজিব্বা কল ধর। ওই রাজিব্বা কল ধর।

- হ্যালো স্লামালাইকুম। হ্যালো।

কোন সাড়াশব্দ নেই। রাজিব আবার বলল, হ্যালো, হ্যালো। ধ্যাত। বিরক্ত হয়ে রাজিব লাইন কেটে দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু পারল না। হঠাৎ মোবাইল কথা বলে উঠল। তাও আবার নারী কণ্ঠ!

- হ্যালো। কি বিরক্ত হচ্ছেন নাকি? আসলে চুপ করে থেকে আপনার ধৈর্য্যরে পরীক্ষা নিচ্ছিলাম।

- তাই নাকি! কিন্তু আমার পরীক্ষা নেয়ার আপনি কে?

- আমি কে সেটা জানা কি খুব জরুরি?

- হ্যাঁ জরুরি। অপরিচিত কারো সাথে আমি কথা বলি না।

- আচ্ছা এখন আমরা অপরিচিত, একটু পরেই পরিচিত হব। তাছাড়া কথা না বললে কি পরিচিত হওয়া যায়?

- হ্যাঁ তা ঠিক যায় না। আচ্ছা বলেন তো আপনি কে? আমাকে কেন কল করেছেন? আমার নাম্বারই বা কোত্থকে পেলেন?

- আস্তে বাবা, আস্তে। এতগুলো প্রশ্ন! একবারে তো উত্তর দেয়া যায় না। ধীরে ধীরে দেই। কণ্ঠ শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি একটা মেয়ে। আমার নাম...।

নাম বলার আগেই লাইনটা কেটে গেল। তাড়াতাড়ি রাজিব মেয়েটাকে কলব্যাক করল। কিন্তু কোন লাভ হল না। সে যতবারই কল দিল, ততবারই উত্তর মিলল, আপনার কাঙ্ক্ষিত নম্বরে এখন সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। অনুগ্রহপূর্বক একটু পর আবার চেষ্টা করুন।

লুসির আজকে পরীক্ষা দেয়ার কথা। যদিও রাজিব ধরেই রেখেছে যে সে পরীক্ষা দেবে না। তবে সে যদি ভুলক্রমে পরীক্ষা দিয়েই ফেলে তাহলে তা হবে 'সূর্য পশ্চিমদিকে উদিত হয়' এমন টাইপের ঘটনা!

লুসি সামনে এসে বসতেই রাজিব জিজ্ঞেস করল, আজকে তো পরীক্ষা, তাই না? নিশ্চয়ই সব পড়া হয়ে গেছে?

মুখ অন্ধকার করে লুসি জবাব দিল, না স্যার কিছুই হয়নি।

- কেন? কি হয়েছে? শরীর খারাপ ছিল নাকি?

- না স্যার। শরীর খারাপের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল। তাই অনিবার্যকারণবশত আজ পরীক্ষা হবে না।

- কি সব উল্টাপাল্টা বলছ?

- স্যার আজকে তো হরতাল ছিল।

- তাতে কি?

- স্যার হরতালে তো সাধারণত সবই বন্ধ থাকে, তাই আমার পড়াশুনাও বন্ধ ছিল।

রাজিব কি বলবে বুঝতে পারছিল না। এখন তার মাথায় ছোটবেলায় শেখা একটা কথা যেন ভন ভন করে ঘুরতে লাগল, 'মাইরের নাম লক্ষ্মীকান্ত, ভূত পালায় যায় ডরে।' লুসিকে তো আর মারা যাবে না। হালকা শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

- এই মেয়ে দাঁড়াও, দাঁড়াও বলছি। রাজিবের হঠাৎ কঠোর কণ্ঠে লুসি যেন একটু ভয়ই পেল। সে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে গেল।

- কান ধরো।

- জ্বি স্যার?

- কান ধরতে বলেছি। ধরো। ধরো বলছি। লুসি বাধ্য হয়ে কান ধরল। এবার দাঁড়িয়ে থাকো।

রাতে রাজিব একটু তাড়িতাড়ি শুয়ে পড়ল। কাল সকাল আটটায় ক্লাস। তাই আগে আগে উঠতে হবে। কিন্তু তার ঘুম আসছিল না। একবার ডানে কাত হয়ে, আবার বামে ফিরে তার সময় কাটতে লাগল। হঠাৎ মোবাইল বেজে উঠল। এ তো সেই মেয়েটার নম্বর যে গতরাতে নাম বলেনি।

- হ্যালো, ভাল আছেন? বলল রাজিব।

- হ্যাঁ ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?

- খুব একটা ভাল নেই। আসলে আজ মনটা বেশ খারাপ।

- মন খারাপের কারণ কি? প্রেমঘটিত নাকি?

- আরে নাহ। ওসব কিছু না। স্টুডেন্টকে বকা দিয়েছি তো তাই। আসলে একটু বেশিই বকেছি। এতটা করা ঠিক হয়নি।

- বাহ স্টুডেন্টের জন্য তো আপনার দারুণ টান! নিশ্চয়ই আপনার স্টুডেন্ট সুন্দরী এক মেয়ে?

- হ্যাঁ মেয়ে। তবে সুন্দর কিনা বলতে পারব না। কখনো ওভাবে খেয়াল করে দেখা হয়নি।

- আচ্ছা এরপর দেখে এসে বলবেন।

- তা না হয় বললাম। এখন আপনার নামটা বলুন।

- ও তাই তো আমার নামই বলা হয়নি। আমার নাম...।

আবার লাইন কেটে গেল। রাজিব আবার কলব্যাক করল। আবার শোনা গেল, আপনার কাংক্সিক্ষত নম্বরে এখন সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না...।

মেয়েটি এখন প্রায়ই রাজিবকে কল করে। ধীরে ধীরে ওদের মধ্যে একধরনের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সম্বোধন ‘আপনি’ থেকে ‘তুমি’-তে নেমে আসে। আস্তে আস্তে ওদের কথা বলার সময়সীমাও বাড়তে থাকে... পাঁচ মিনিট... দশ মিনিট... আধ ঘন্টা... এক ঘন্টা...। এখন মাঝে মাঝে রাজিবও কল করে। কথা হয়। তবে পুরনো সমস্যাটা এখনো রয়ে গেছে। মেয়েটি তার নাম বলে না। নাম জিজ্ঞেস করলেই লাইন কেটে দেয়। তারপর সেট বন্ধ করে রাখে।

- হ্যালো রাজিব কি করছ?

- কিছু না। গান শুনছিলাম।

- কি গান?

- ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে, তোমায় করেছে রাণী...।

- হঠাৎ ভালোবাসার গান? কারো প্রেমে পড়েছ নাকি?

- আমি তো প্রেমে পড়েই আছি।

- কার?

- কার আবার! তোমার।

- আমার!

- হ্যাঁ তোমার।

- প্রমাণ দাও।

- এই যে নাম জিজ্ঞেস করলেই তুমি লাইন কেটে দাও। তারপরও আমি ঘন্টার পর ঘন্টা রাগ না করে তোমার সাথে ধৈর্য্য সহকারে কথা বলে যাচ্ছি। এটা কি প্রেম না?

- কি জানি! আচ্ছা বল তো ভালোবাসা কি?

- আসলে ভালোবাসা একেকজনের দৃষ্টিতে একেকরকম। এই যেমন ধর আমার এক ফ্রেন্ড সারোয়ার। ওর ভালোবাসা হচ্ছে প্রতি মাসের এক তারিখ।

- কেন?

- কারণ এ দিন ও টিউশনির টাকা পায়। হা হা হা।

- তুমি তো মজা করছ। আমি কিন্তু সিরিয়াসলি জিজ্ঞেস করেছি।

- সিরিয়াসলি?

- হ্যাঁ, সিরিয়াসলি।

- তাহলে আজ না, ১৪ ফেব্রুয়ারী বলব।

- সামনাসামনি বলতে পারবে?

- হ্যাঁ পারব। অফকোর্স পারব। বল কোথায়, কখন বলব। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ বল, এই বল না প্লিজ।

- পিজাহাটে। বিকেল চারটা।

- ঠিক আছে। কিন্তু আমি তোমাকে চিনব কি করে? আজ তোমার নামটা বল না প্লি- ল- ল- জ।

- ও হ্যাঁ তাই তো। আমার নাম...।

লাইনটা যথারীতি কেটে গেল। কিন্তু রাজিবের মনের লাইন কাটল না। তা যেন মনের জমিতে নতুন নতুন পিলার বসিয়ে আরও বিস্তৃত হতে লাগল! আজ এখানে এসে যে লুসির সাথে দেখা হবে তা রাজিব ভাবতেও পারেনি। রাজিবকে দেখেই লুসি বলল, স্লামালাইকুম স্যার। স্যার আপনি এখানে?

- হ্যাঁ মানে এখানে আমার এক ফ্রেন্ড আসবে তো, তাই?

- ও আচ্ছা।

- কিন্তু তুমি?

- স্যার আমারও এক ফ্রেন্ড আসবে। আসি স্যার।

- ঠিক আছে। লুসি আজ শাড়ি পরেছে। বেশ সুন্দর লাগছে। অনেক পূর্ণ মনে হচ্ছে। বাসায় ওকে এত বড় লাগে না। আসলে সবই শাড়ির অবদান। কিন্তু ও আসছে না কেন? রাজিব কয়েকবার মোবাইলে চেষ্টা করল। কিন্তু ওর সেট বন্ধ। কি করা যায়? নাম জানা নেই, চেহারাও অচেনা। কিভাবে যে ওকে ভালোবাসার সংজ্ঞা শোনাব? রাজিব ঘড়ি দেখে। প্রায় পাঁচটা বাজে। ধ্যাত ভাল লাগছে না। চলে যাব নাকি? ভাবতে ভাবতে রাজিব রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। গাড়ি আসে, গাড়ি যায়। মানুষ আসে, বাড়ি যায়। শুধু সে আসে না। শেষ একটা চেষ্টা করি। এটায় ফেল হলে চলে যাব। রাজিব মোবাইল হাতে নেয়। হ্যাঁ এবার রিং হচ্ছে। হ্যালো, হ্যালো।

- হ্যাঁ হ্যালো বলো।

- তুমি কোথায়?

- এই তো কাছেই।

- আচ্ছা এখানে এত ভিড়ে তোমাকে চিনব কি করে?

- দেখলেই চিনতে পারবে।

- যার নামই জানি না, তাকে দেখে চিনব কিভাবে?

- ও নাম! আচ্ছা শোন। আমার নাম লুসি।

- লু... লুসি! রাজিবের মনে হল কে যেন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখল লুসি, হাতে মোবাইল সেট।

- তুমি! রাজিবের চোখ-মুখে যেন পৃথিবীর সমস্ত বিস্ময় এসে ভর করে।

- হ্যাঁ আমি। হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন!

- ওহ... হ্যাঁ... হ্যাপি ভ্যালেন্টাইন!

একটি লোমহর্ষক মাইক্রো গল্প!

- পারবি না?

- হাঁ পারব। পারতে আমাকে হবেই।

- ও কিন্তু অনেক চালাক! ধরা খাবি নাতো আবার?

- না।

- সাবাশ। তাহলে যা। একবারে ছিবড়ে বানিয়ে ছেড়ে দিবি। আজীবন যেন তোর কথা মনে রাখে। শালি হারামজাদী!

- হুম।

- টিপে টিপে লাশ বানিয়ে দে।

- হুম।

- দেখিস শালি যেন বুঝতে না পারে। একটু একটু করে ওর সব ছিড়ে খাবি।

- হুম। দোয়া রেখো।

- ও আমাকে শেষ করেছে। আমিও ওকে শেষ করে দেব। আমি ওর রক্ত চাই।

- হুম।

- আমি রক্তের সাগরে ওর ভেসে থাকা টুকরো শরীর দেখতে চাই। যা মার যা... ... ...

- দূর গাধা! এবারও মশাটা মারতে পারলি না!

পাগল

[এক]

- হরকান্তদা, কেমন আছ?

- আজ্ঞে, দাদা, ভাল।

- তা, দাদা দ্যাশের অবস্থা কেমন বুঝতাছো?

- ভাল না, দাদা। গন্ডগোল। যুদ্ধ হইতে পারে।

- আচ্ছা নীলা কে, দাদা?

- একটা বেশ্যা।

- ও না তোমার বউ ছিল?

- বেশ্যারা তো সবার বউ।

- দাদা, বলো তো দেখি এখন কত সাল?

- ১৯৭১।

সেই ছোটবেলা থেকেই হরকান্তদাকে এই একই রকম দেখে আসছি। পুরনো, ময়লা একটা কোট গায়ে। ছেঁড়া-খোঁড়া প্যান্ট পরনে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। চোখের নিচে গাঢ় কালি। উদাসীনভাবে হেঁটে চলে। মাঝে মাঝে ঝিম মেরে বসে থাকে। কখনও বা রাস্তার পাশেই ঘুমিয়ে পড়ে। কেউ কিছু দিলে খায়। না দিলে নাই। এভাবেই হরকান্তর প্রতিটি দিনের শেষে সূর্য ডোবে। সকালে আবার ওঠে। বিকেলে আবার ডোবে।

হরকান্তর পুরো নাম হরকান্ত রায়। বয়স এখন প্রায় ষাট বছর। নাটোরের লালবাজার এলাকায় গেলেই তার দেখা পাওয়া যায়। ওখানে নতুন প্রজন্মের কাছে সে পাগল হিসেবে পরিচিত। কিন্তু সে কি এমনটা ছিল? ছিল না। তারও ছিল সাজানো এক স্বপ্নিল পৃথিবী। সে পৃথিবীর বাসিন্দা ছিল হরকান্ত আর নীলা। চায়ের দোকানির বউ নীলা। নীল স্বপ্ন ছিল তার চোখে। ভালবাসার মানুষটিকে নিয়ে সে বাঁচতে চেয়েছিল। গড়তে চেয়েছিল সুখের স্বর্গ। কিন্তু যুদ্ধ নামক নরক যন্ত্রণায় জ্বলে সে অঙ্গার হয়েছে সেই কবে! কে তার খবর রাখে! কেউ রাখে না! কেউ না!

[দুই]

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী আওয়ামী লীগেরই সরকার গঠনের কথা। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি নেতৃত্বকে মেনে নিতে পারেনি। পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরামর্শে ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তরে

টালবাহানা শুরু করেন। এরূপ পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১লা মার্চ '৭১ এক ঘোষণায় ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। এ ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সর্বস্তরের জনগণ রাজপথে নেমে আসে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করায় বঙ্গবন্ধু ২ ও ৩ মার্চ হরতাল পালনের আহবান জানান। তিনি ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেন। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় তিনি তাঁর ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। উপস্থিত জনতার সম্মুখে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করেন... ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্র"র মোকাবেলা করতে হবে... এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম... এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম...।

[তিন]

হরকান্তর চা দোকান। সে ক্রেতাদের জন্য চা বানাচ্ছে। একজন বলল, ভাই, পরিস্থিতি কিছু বুঝতাছেন?

- কোন পরিস্থিতি ভাই? পাল্টা প্রশ্ন করলেন আরেকজন।

- শুনলাম শেখ সাহেবরে নাকি ক্ষমতা দিবে না।

- ক্যান? দিবে না ক্যান? উনি কি বেশি ভোট পান নাই?

- পাইছেন। তাতে কী? পাঞ্জাবি গো বিশ্বাস নাই।

- এটা কোন কথা হইল?

- না ভাই, হইতেও পারে। আলোচনায় যুক্ত হলেন আরেকজন। রেসকোর্সে শেখ মুজিব কী কইছে? জানেন কিছু?

- কী কইছে?

- যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকতে বলছে। ঘরে ঘরে দুর্গ বানাইতে বলছে।

- কী! যুদ্ধ!

- হ যুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ। ও হরকান্ত, তোমার তো রেডিও আছে। রেডিওতে কী শুনছো এনাগো কও।

হরকান্ত গলা উঁচুতে নিয়ে বলল, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!

ঘরে নতুন বউ। শুধু ওকে দেখতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, ইস ওরে যদি সারাক্ষণ চোখের সামনে রাখতে পারতাম! নীলা তুমি এখন কি করো? আমার জন্য রান্না করো? তোমার কি একা একা ভয় লাগছে? দাঁড়াও,

আমি আসছি। হরকান্ত আর বেশিক্ষণ দোকানে থাকতে পারে না। ঘড়ির কাঁটা আঁটটা ছোঁয়ার আগেই সে তাঁর দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে দেয়।

আজকের আকাশে অনেক তারা। যেন তারার মিছিল। ঝকঝকে আকাশে এক ফালি চাঁদ হাসছে। ঝিরঝিরে বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। কী ফুল? রাতে ফোটে মিষ্টি গন্ধবিলাসী ফুলের নামটা যেন কী? কিছুতেই মনে পড়ে না হরকান্তের। থাক। দরকার নেই। এ ফুলের চেয়ে মিষ্টি গন্ধের ফুল হরকান্তের কাছে আছে। খুব কাছে। একদম বুকের ভেতর। তাঁর বউ নীলা। বউফুল! হরকান্ত বউফুলের চুলের ঘ্রাণ নিতে থাকে। আহ! কী দারুণ! কী...

হরকান্তকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ বউফুল কথা বলে ওঠে। আচ্ছা তুমি এসব কী শুরু করছ?

- কী করছি?

- এই যে রোজ রোজ তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে ঘরে ফির‍্যা আস!

- হ। তাতে কী হইছে?

- মাইনষে কী কয়?

- কী কয়?

- তুমি বোঝো না?

- না। বুঝি না।

- তোমারে বউ-পাগলা কয়।

- কউক। আর ঠিকই তো কয়। আমি তো বউ-পাগলাই!

- ধ্যাত! কী যে কও না! নীলার চোখ মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। লজ্জিত হলেও স্বামীর মুখে এমন পাগলাটে কথা শুনতে তার ভালই লাগছিল। লাগতেই হবে। ভালবাসার মানুষ বলে কথা। তবুও কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে সে বলল, তুমি আসলেই একটা পাগল!

[চার]

'৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঘুমন্ত, নিরস্ত্র মানুষদের উপর। রাজধানী ঢাকায় তারা প্রথমে হামলা করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসে এবং পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী ইপিআর-এর সদর দফতরে। এরপর তারা ধ্বংস করেছে ঢাকার বস্তি, বাজার এবং হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র, শিক্ষক-কর্মচারীদের ঘরে ঢুকে কিংবা ঘর থেকে বের করে এনে হত্যা করেছে তারা। বাজার ও বস্তিগুলোতে তারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আগুনের ভয়ে হাজার হাজার মানুষ যখন ঘর থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসেছে, তখন ওদের ওপর মেশিনগানের গুলি বর্ষিত হয়েছে একটানা, যতক্ষণ না প্রতিটি মানুষ নিহত হয়। এসব মানুষ জানতেও পারেনি কেন তাদের হত্যা করা হচ্ছে কিংবা কারা হত্যা করছে।

অপারেশন সার্চ লাইট-এর নামে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে শুধুমাত্র ঢাকায় পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার নিরীহ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। ঢাকা পৌরসভার কয়েকজন সুইপারের জবানবন্দি থেকে পাক সৈন্যদের নৃশংসতা সমপর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে। এই সুইপারদের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল লাশ সরাবার জন্য।

১৯৭১ এর ২৯ মার্চের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ছোটন ডোমের পুত্র সরকারি পশু হাসপাতালের সুইপার পরদেশী বলেছেন, ২৯ মার্চ সকালে আমি ঢাকা পৌরসভা অফিসে হাজির হলে আমাকে ট্রাক নিয়ে লাশ তোলার জন্য আরও কয়েকজন সুইপারের সাথে শাঁখারি বাজারে যেতে বলা হয়। জজ কোর্টের সম্মুখে আগুনের লেলিহান শিখা তখনও জ্বলছিল। আর পাক সেনারা টহলে মোতায়েন ছিল বলে আমরা ট্রাক নিয়ে সে পথ দিয়ে শাঁখারি বাজারে প্রবেশ করতে পারি নাই। পাটুয়াটুলি ঘুরে আমরা শাঁখারি বাজারের পশ্চিম দিকে প্রবেশ করি। পাটুয়াটুলি ফাঁড়ি পার হয়ে আমাদের ট্রাক শাঁখারি বাজারের মধ্যে প্রবেশ করল। ট্রাক থেকে নেমে আমরা শাঁখারি বাজারের প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রবেশ করলাম- দেখলাম মানুষের লাশ, নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা, কিশোর, শিশুর বীভৎস পচা লাশ। চারদিকে ইমারতগুলো ভেঙে পড়ে আছে। মেয়েদের অধিকাংশ লাশ আমি সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেখলাম। দেখলাম তাদের বুক থেকে স্তন তুলে নেয়া হয়েছে। কারো কারো যোনি পথে লাঠি ঢুকানো আছে। বহু পোড়া ভস্ম লাশ দেখেছি। পাঞ্জাবি সেনারা পাষন্ডের মত লাফাতে লাফাতে গুলি বর্ষণ করছিল...।

এরই মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা ২৫ মার্চ গভীর রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মীদের করনীয় নির্দেশ দিয়ে যান। ২৬ মার্চ ওয়্যারলেযোগে প্রাপ্ত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার থেকে দুপুর বেলায় প্রচার করেন। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম বেতারের কিছু কর্মী, শিল্পী, শিক্ষক চট্টগ্রাম কালুরঘাটে একটি অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র চালু করেন এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে মর্মে খবর প্রচার করতে থাকেন। ২৭ মার্চ সন্ধ্যাবেলায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার আর একটি ঘোষণা প্রচার করেন। স্বাধীনতার ঘোষক কে এ নিয়ে দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা আজও বিতর্কে জড়িয়ে আছি। ছোটবেলায় জেনেছি একজন। এখন শুনি আরেকজন। আমি আমার স্কুলজীবনে যা পড়েছি এখানে তা-ই লিখেছি।

[পাঁচ]

- ও হরকান্ত শুনছ কিছু?

- কী হইছে দাদা!

- ঢাকায় মিলিটারি নামছে। হাজার হাজার মানুষ মারছে।

- কী কন?

- হ।

- শহর দিয়া দলে দলে মানুষ গ্রামে আইতাছে। সবাই ঢাকা ছাড়তাছে।

গনি শেখের কথা শুনে হরকান্ত চিন্তিত হয়ে পড়ে। তবে এটা ঠিক যে, সে বুঝতে পারছে না তার কি করা উচিৎ। সহজ, সরল, সাদাসিধে তার মত একজন মানুষ যে কিনা গভীরভাবে ভাবতে পারে না। খুব বেশি পড়াশুনাও তার জানা নেই। তাই তখনকার উত্তাল পরিবেশে তার যতটা আন্দোলিত হওয়া উচিৎ ছিল সে তার পুরোটা হতে পারে না। তবে তার চিন্তা হয় নীলার জন্য। তার ও নীলার স্বপ্নগুলোর জন্য। সামনে কি খুব বিপদ? হরকান্ত চিন্তিত স্বরে গনি শেখকে জিজ্ঞাসা করে, মিলিটারি কি এ জায়গায় আইবো?

- তা ক্যামনে কই? ওগো বিশ্বাস নাই। আইতেও পারে।

- যদি আয় তাইলে কী হইবো? চোখে শঙ্কা হরকান্তের।

- গতরাতে আমার শ্যালক মন্টু ঢাকা দিয়া আইছে। ওর কাছে শুনলাম ২৫ মার্চ রাইতে ওরা যারে সামনে পাইছে তারেই মারছে। মাইয়াগো রেপ করছে। ঘরবাড়ি দোকানপাট সব জ্বালাইয়া দিছে। মন্টু অনেক কষ্ট কইরা কোনমতে জানটা নিয়া পালাইয়া আইছে।

- দাদা গো, তাইলে আমার এই দোকানের কী হইব? দোকান জ্বালাইয়া দিলে আমি কী খামু? বউরে কী খাওয়ামু?

- দুররো! থামো তো। ওরা তো এখনও এখানে আসে নাই। হরকান্তকে শান্ত করার চেষ্টা করে গনি শেখ। দ্যাও তো, এক কাপ চা দ্যাও। হরকান্ত চা দেয়। এবার কিন্তু সে সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়ে।

[ছয়]

রাতে হরকান্ত আর তার বউ নীলা খেতে বসেছে। কৈ মাছের ঝোল, ডাল আর ভাপ ওঠা সাদা ভাত। ভাত খেতে খেতে হরকান্ত বলে, বাহ বউ! তোমার রান্না দারুণ হইছে। এত ভাল রান্না তোমারে কে শিখাইছে?

- কেউ না। আমি একা একা শিখছি।

- একা একা?

- হ। একদম একা।

- আইচ্ছা, আমারে রান্না শিখাবা?

- কী কও! ব্যাটা হইয়া তুমি রান্না শিখবা? বউর চোখে রাজ্যের বিস্ময়।

- হ। শিখমু। এতে এত অবাক হওয়ার কী আছে?

- না মানে... মানে...

- আরে এত মানে মানে করার কিছু নাই। আমি তোমার কাছে রান্না শিখতাছি এটাই ফাইনাল। হরকান্তর মনে হঠাৎ দুষ্টুমি খেলে যায়। সে বলেই ফেলে, আরে বউ, যখন তুমি পোয়াতি হবা তখন তো তুমি রান্নাবান্না করতে পারবা না। আমারেই তো করতে হইব। তাই না?

- দুর! তুমি যে কী কও! পাগল! লজ্জিত কণ্ঠে বলে নীলা। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেয়। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন ভাত খাও। ভাতে পোকা পড়ব তো!

- ও, তাই তো। হরকান্ত ভাত খেতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

[সাত]

এলাকায় নতুন একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নাম -শান্তি কমিটি। এ কমিটি এখানে শান্তিরক্ষা করবে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় ভূমিকা রাখবে। কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা কফিলউদ্দিন। সে-ই হবে শান্তি রক্ষায় প্রধান কাণ্ডারি। তার নেতৃত্বেই এখনকার মানুষ পাকিস্তানের খেদমত করবে।

সদ্যগঠিত কর্মীবাহিনী নিয়ে কফিলউদ্দিন গেছে হরকান্তর দোকানে চা খেতে। কী হরকান্ত! ভাল আছো তো? জিজ্ঞেস করে কফিলউদ্দিন।

- আজ্ঞে, দাদা। আছি এক রকম।

- আচ্ছা বেশ বেশ। তা আমাগো সবাইরে চা দ্যাও তো দেখি।

- দিতাছি।

- শোন হরকান্ত। জানো তো, শান্তি কমিটি করলাম। পাকিস্তানরে বাঁচাইতে হইব। তাই এ কমিটি। এরপর কফিলউদ্দিন গলা নামিয়ে বলল, মুক্তি বা জয়বাংলাওয়ালা গো খবর জানলেই আমাগো জানাবা, ঠিক আছে? ওরা গাদ্দার। পাকিস্তানের শত্র‘‘।

নিরুত্তর থাকে হরকান্ত। এতে সন্দেহের চোখে তাকায় কফিলউদ্দিন। মনে মনে বলে, শালা মালাউন! ইন্ডিয়ার দালাল! এরপর জোর গলায় বলে, কী, বুঝছ আমি কী কইছি?

- জে, জে, বুঝছি। হরকান্ত থতমত খেয়ে যায়।

[আট]

কয়েকদিন পর। তখন রাত। ঘড়ির কাঁটা আঁটটা ছুঁই ছুঁই। আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলছে। তারার সাথে যেন পাল্লা দিয়েছে ঝোপঝাড়ের জোনাকিরা। আজ চাঁদ ওঠেনি। তাই অন্ধকারের গাঢ়ত্ব যথেষ্ট গভীর। হরকান্ত এখনো দোকানে বসে আছে। হ্যারিকেনের আলোয় খুব বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। ভ্যাপসা গরমে ঘেমে প্রায় নেয়ে উঠেছে হরকান্ত। গাছের পাতাগুলো একদম স্থির। যেন আঁকা ছবি। ইস! একটু বাতাস বইত! খদ্দেরবিহীন এভাবে আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়! হরকান্তর ভাল লাগছে না। বাড়ি তাকে টানছে। ওদিকে বউটা একা একা কী না কী করছে? বেচারি! সারাদিন একা একা কষ্ট করে, অথচ মুখে ওর সারাক্ষণ হাসি লেগেই আছে। কোনও ক্লান্তি নেই। হরকান্ত চোখ বুজে নীলার হাসিমুখ দেখার চেষ্টা করে।

হঠাৎ ঠাশ ঠাশ ঠাশ! এ কী! গুলির শব্দ! বাঁচাও বাঁচাও! মিলিটারি! মিলিটারি! আগুন! আগুন! বাঁচাও! বাঁচাও! ঠাশ ঠাশ ঠাশ... !

কোনমতে দোকানের ঝাঁপটা নামিয়েই বাড়ির পথে দৌড়ে যায় হরকান্ত। কিন্তু সে যেতে পারে না। পথে পাকিস্তানি মিলিটারির সামনে পড়ে যায়। ওকে দেখা মাত্রই দুইজন সেনা ওর দিকে তেড়ে আসে। হরকান্ত দৌড়ে একটা বাগানে ঢুকে পড়ে।

ঠাশ!

পিছন থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। সে থামে না। দৌড়াতে থাকে। দৌড়ে দৌড়ে একসময় হানাদারদের নাগালের বাইরে চলে যায়। এতক্ষণ দৌড়ে হরকান্ত প্রচণ্ড হাঁপিয়ে গেছে। তাই সে একটু দম নেয়। বুকের মধ্যে খুব ধুক ধুক করছে। যেন হৃৎপিন্ডটা পাঁজরের হাড়ের সাথে বাড়ি খাচ্ছে। কী হবে এখন? নীলা! নীলার কী হবে? না জানি ও কেমন আছে! হায় ভগবান, তুমি এ কোন বিপদে ফেললা! তোমার কাছে হাতজোড় করছি, তুমি নীলারে রক্ষা করো। রক্ষা করো।

[নয়]

কয়েক ঘণ্টা পর হরকান্ত ফিরে এল। কিন্তু এ সে কোথায় এসেছে? এটা কি তার বাড়ি, নাকি শ্মশান? সবকিছু ছড়ানো ছিটানো। ভাঙাচোরা। সব এলোমেলো হয়ে গেছে। ওই তো মেঝেতে নীলার হাতের শাঁখার ভাঙা টুকরো পড়ে আছে। নীলা! নীলারে... !

হরকান্ত চুপচাপ বসে থাকে। উদাসীনভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারার পেছনে তারা ছোটে। মেঘের পেছনে মেঘ। একটা কুকুর করুণ সুরে কেঁদে চলেছে, ঘেউ- উ- উ- উ! খান্ডব দহনে দগ্ধ হতে থাকে হরকান্তর মন। কিন্তু নিরস্ত্র, একা সে কী করবে? কিছুই করতে পারে না। শুধুই দগ্ধ হতে থাকে। এরমধ্যে প্রতিবেশী বিধবা বৃদ্ধা মরিয়ম বিবি ঘরে এল। বাবা, মাইয়াডা কফিলউদ্দির কত হাত পায়ে ধরল! ব্যাডায় ছাড়ল না। তুইলা নিয়া গেল। আমি ঠেকাইতে গেছিলাম। আমারে ওরা ধাক্কা দিয়া ফালাইয়া দিছে।

নীলাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় হানাদারদের ক্যাম্পে। শুধু নীলা নয়, সখিনা, জরিনা, মহুয়া, মালতি, লতা এমন নাম না জানা হাজারো মা-বোনকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিদের ডেরায়। তারপর...

[দশ]

তারপর কী হয়েছিল তা আমি জানি না। কেননা বীরাঙ্গনাদের ত্যাগের করুণ কাহিনী কোনও এক বিচিত্র কারণে তরুণ প্রজন্মের সামনে প্রকাশ পায়নি। হয়ত প্রকাশ করা হয়নি। যা হোক।

প্রত্যক্ষদর্শী রাবেয়া খাতুনের কথা শুনে আমরা আঁচ করতে পারি কী ভয়াবহ ছিল সেইসব দিনগুলো, যার অন্ধকার অমাবস্যার কালোত্বকেও হার মানিয়েছিল। '৭১-এর ২৫ মার্চের পর রাজারবাগ পুলিশ লাইনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের নারকীয় দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন সেখানকার সুইপার রাবেয়া খাতুন। তার ভাষায়...

ওরা (পাকি আর্মিরা) ব্যারাকে ব্যারাকে প্রবেশ করে প্রতিটি যুবতী, মহিলা ও বালিকার পরনের কাপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ করে মাটিতে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে বীভৎস ধর্ষণে লেগে গেল...

আমি দেখলাম পাক সেনারা সেই মেয়েদের উপর পাগলের মত উঠে ধর্ষণ করছে আর ধারাল দাঁত বের করে বক্ষের স্তন ও গালের মাংস কামড়াতে কামড়াতে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে...

অনেক পশু ছোট ছোট বালিকাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসাড় রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দুজনে দুপা দুদিকে টেনে ধরে চড়চড়িয়ে ছিড়ে ফেলে দিল...

[এগারো]

হরকান্ত পাগলের মত নীলার খোঁজ করে। কিন্তু পায় না। মাঝে মাঝে তার ইচ্ছে করে কফিলউদ্দিনের গলা চেপে ধরে নীলার খবর জিজ্ঞেস করে। সাহসে কুলোয় না। সশস্ত্র রাজাকারটার সামনে গেলেই নিরস্ত্র হরকান্তের জানটা যাবে। তাই হরকান্তর অস্ত্র চাই! অস্ত্র! মুক্তি চাই! স্বাধীনতা চাই! হরকান্ত যুদ্ধে চলে যায়।

সময় গড়িয়ে যায়। থেমে থাকে না ঘড়ির কাঁটা। দিন আসে, রাত হয়। রাত যায়। দিন আসে। আবার...। বাতাসে ভাসে বারুদের গন্ধ। ভেসে আসে লাশের গন্ধ। পোড়া গন্ধ। চিৎকার! বাঁচাও! বাঁচার আকুতি। রক্ত! রক্ত! রক্ত! খালে লাশ। বিলে লাশ। মাঠে লাশ। ঘাটে লাশ। শুধু লাশ আর লাশ। পচা লাশের মাংস খায় শিয়াল, শকুন, কাক, কুকুর। রক্তের স্রোত বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে রক্তের সাগর হয়ে যায়। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

[বার]

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসে হরকান্ত। পরনে কোট-প্যান্ট। যদিও সেগুলো একটু পুরনো। তবুও ওসবে তাকে ভালই লাগছিল। যুদ্ধের সময় জলিল নামের এক সহযোদ্ধা তাকে এগুলো উপহার দিয়েছিল। ছেলেটি ছিল ধনী পরিবারের। কোটপ্যান্ট পরেই যুদ্ধে চলে এসেছিল। পরে কী মনে করে যেন সে ওগুলো হরকান্তকে দিয়ে দেয়। এর কারণ হরকান্তও জানে না। হানাদার ক্যামপ থেকে নীলাকে উদ্ধার করা হয়। হরকান্ত প্রথমে যেন ওকে চিনতেই পারছিল না। কোথায় তার বউফুল? এ যেন এক বিধ্বস্ত প্রতিমা। শ্রান্ত। মলিন। অবসন্ন। নীলা ঠিক মত হাঁটতে পারছিল না। হরকান্ত কোলে করে ওকে বাড়ি নিয়ে আসে।

নীলা অনেক বদলে গেছে। সে আর আগের মত হাসে না। কথাও বলে না। সারাক্ষণ চুপচাপ ফ্যাল ফ্যাল করে শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে হরকান্ত, শোনো, যা হবার হইছে। ওসব ভুইলা যাও। তুমি আবার আগের মত হইয়া যাও। একটু হাসো। একটু হাসো। নীলা হাসে না। সে যেন হাসতে ভুলে গেছে। সে থাকে নিরুত্তর। তবুও হাল ছাড়ে না হরকান্ত। সে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। একসময় সে দেখতে পায় নীলা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। কিন্তু একদিন হরকান্ত জানতে পারে নীলা গর্ভবতী। পেটে তার হানাদারদের সন্তান।

[তেরো]

হরকান্ত চেয়েছিল নীলাকে নিয়ে কোন ডাক্তার-কবিরাজের সাথে কথা বলবে। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে তখন ডাক্তাররা আজকের মত এতটা সহজলভ্য ছিল না। তাছাড়া সে তার সুযোগও পায়নি। এর আগেই ব্যাপারটা রাষ্ট্র হয়ে যায়। অনেকে ছিঃ ছিঃ করতে থাকে। কিন্তু তারা একবারও ভাবল না, এতে মেয়েটার দোষ কোথায়। কী তার অপরাধ?

আসলেই মানুষ বড় বিচিত্র। সবচেয়ে বিচিত্র হচ্ছে তাদের মন। কখন যে কার পক্ষ নেয় তা হয়ত অনেক সময় মানুষ নিজেই জানে না।

দু'দিন পর।

স্থান হরকান্ত রায়ের বাড়ির উঠোন। সালিশ বসেছে। বিচার হবে নীলার। তার অপরাধ, কেন সে খানসেনাদের বাচ্চা পেটে নিয়ে আছে! বিচার করতে এসেছে স্থানীয় মাতব্বররা। প্রধান বিচারক হল কফিলউদ্দিন। সেই রাজাকার। অনেক রাজাকারের মতই তার কিছুই হয়নি। কিছুদিন পালিয়ে ছিল। এখন আবার ফিরে এসেছে বহাল তবিয়তে। আমাদের দেশটা যে কত বড় দুর্ভাগা তা ভাবতে খুব কষ্ট হয়! কিন্তু কি করার আছে!

কিছুই কি নেই?

কফিলউদ্দিন উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ করে বলতে শুরু করে, ভাইসব, বলেন তো দেখি এই মাইয়াটারে নিয়া কী করন যায়? তার পেটে খানসেনা গো বাচ্চা। বলেন আপনারা এরে কী শাস্তি দেয়া যায়?

প্রতিবাদ করে হরকান্ত। শাস্তি মানে! কইলেই হইল? ওর কি দোষ? ও কি ইচ্ছা কইরা খানসেনা গো কাছে গেছে?

- যাইতেও তো পারে। বিশ্বাস কী? ফোড়ন কাটে কফিলউদ্দিন।

- হারামজাদা, রাজাকার। তুই-ই তো ওরে... হরকান্ত আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। দৌড়ে মারতে যায় কফিলউদ্দিনকে। কিন্তু তাকে ধরে ফেলে কফিলউদ্দিনের কয়েকটা চামচা। হরকান্তর মনে হতে থাকে, ইস স্টেনগানটা কেন যে জমা দিলাম! ওটা যদি এখন হাতে থাকত। এক পর্যায়ে তাকে একটা গাছের সাথে বেঁধে ফেলা হয়।

কফিলউদ্দিনের প্রহসন নাটকের কয়েকটা অঙ্ক তখনও বাকি ছিল। তবে সেসব মঞ্চস্থ হতে খুব বেশি দেরি হল না। কুশলী অভিনেতা কফিলউদ্দিন। ক্ষণে ক্ষণে সে ভোল পাল্টাতে জানে। জানে কীভাবে মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়। আর মানুষগুলোও যেন কেমন! মেরুদন্ডহীন! আসলে বেশিরভাগ সাধারণ মানুষই এমন। তারা নিজেরা কথা বলতে চায় না। ভয় পায়। সমাজের কথিত শক্তিশালী অংশ তাদের যেদিকে যেতে বলে তারা সেদিকেই যায়। জোয়ার যেদিকে, তারাও সেদিকে। নিজেদের যেন কোনও অনুভূতি নেই। থাকলেও তারা তা প্রকাশ করে না। করতে চায় না। করতে পারে না। অথচ তারা বুঝতেও পারে না গুটিকয়েক কফিলউদ্দিনের হম্বিতম্বি তাদের সম্মিলিত শক্তির সামনে কিছুই না। বিন্দুর চেয়েও ক্ষুদ্র।

- শোনেন ভাইসব! নীলাকে দেখিয়ে বলল কফিলউদ্দিন। এই মাইয়াটার পেটে অবৈধ বাচ্চা। অবৈধ বাচ্চা ভাল মাইয়া মাইনষের হয় না। অবৈধ বাচ্চা হয় বেশ্যা গো। বেশ্যারাই অবৈধ বাচ্চার জন্ম দেয়।

- হারামজাদা। কুত্তার বাচ্চা। চুপ কর কফিলউদ্দির বাচ্চা! রাগে, ক্ষোভে, ঘৃণায় চিৎকার করে ওঠে হরকান্ত। নীলার আইজ এ অবস্থার জন্য কে দায়ী? তুই দায়ী! তুই! তুই- ই তো ওরে পাঞ্জাবী গো হাতে দিছিলি। তোরে আমি ছাড়মু না। তোরে আমি গুলি করুম... তোরে... আহ!

হরকান্তকে আর কিছু বলতে দেয়া হল না। হঠাৎ করে কফিলউদ্দিনের এক চামচা হরকান্তর মাথায় লাঠি দিয়ে জোরে আঘাত করে। মাথা ফেটে মুষড়ে পড়ে হরকান্ত। তবুও সে ক্ষীণস্বরে বলতে চেষ্টা করে, ভাইসব, আপনারা এ অন্যায় মানবেন না। আপনারা ওই শয়তানের কথা শুইনেন না।

আশ্চর্য! উপস্থিত মানুষগুলোর একজনও হরকান্তর পাশে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, টু-শব্দটিও করল না। তারা যেন নির্বাক। নীরব ছবির অপ্রয়োজনীয় অংশ মাত্র। ধীরে ধীরে হরকান্তর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তার সামনের পৃথিবী ক্রমশ অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। অসপষ্টভাবে কিছু দৃশ্য, কিছু শব্দ অস্ফুটভাবে তার কাছে আসতে থাকে। কফিলউদ্দিন বলছে... বিচার... শাস্তি... দোররা... হ্যাঁ... হ্যাঁ... একঘরে... নীলার চিৎকার... মাগোরে... বাঁচাও... আহ... আহ... আহারে...

একসময় হরকান্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

[চোদ্দ]

জ্ঞান ফেরার পর হরকান্ত জানতে পারে নীলা আত্মহত্যা করেছে। তাকে লাশের সামনে নেয়া হয়। যাক! ভাল হইছে! মরছে! বাঁচছি! বেশ্যা! সবাইকে অবাক করে দিয়ে অদ্ভুতভাবে কথাগুলো বলে হরকান্ত। তারপর ঝরঝর করে কাঁদতে শুরু করে।

[পনের]

২০০৬ সাল। মার্চ মাস। দুটো কিশোর হরকান্তদাকে নিয়ে কথা বলছে। জানিস ওই পাগলটাকে এখন কত সাল জিজ্ঞেস করলে কী বলে?

- কী বলে?

- জিজ্ঞেস করেই দ্যাখ না।

- আচ্ছা।

হরকান্তদা রাস্তার পাশে চুপ করে বসে ছিল। কী যেন ভাবছিল। হয়তো নীলার কথা-ই চিন্তা করছিল। কিশোর ছেলেটি তার কাছে গিয়ে বলল, দাদা, এখন কত সাল?

প্রশ্ন শুনে হরকান্ত নিরুত্তাপ জবাব দেয়, ১৯৭১...

বিপরীত শব্দ

[এক]

- বাবা, তুমি কবে দেশে আসবে?

- আসবো মা, আসবো। ছুটি পেলেই আসবো।

- আমার জন্য কি আনবে?

- এত্ত বড় একটা বারবি ডল!

- কত্ত বড়? আমার চেয়েও বড়?

- হ্যাঁ। তুমি খুশি হবে না?

টেলিফোনের রিসিভার কানে খুব জোরে চেপে ধরে মিষ্টি করে একটা হাসি দেয় প্রবাসি নাজমুল সাহেবের পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে অর্পা।

[দুই]

দুপুরবেলা। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। এইমাত্র দোলা তার মেয়ে অর্পাকে নিয়ে বাসায় এসেছে। ছিমছাম গোছানো ড্রইংরুমে ফুল স্পীডে এসি চলছে। অর্পা আর সময় নষ্ট না করে দ্রুত টিভি দেখতে বসে গেল -টমের সাথে জেরির দ্বন্দ্ব ওর খুব ভাল লাগে।

হঠাৎ ইন্টারকমে রিং হল। অর্পা রিসিভ করল।

- হ্যালো।

- আপামণি অর্পণ নামে এক লোক আইছে। ফোনের ওপাশ থেকে সিকিউরিটি বলল।

অর্পা কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই দোলা ওর হাত থেকে রিসিভার নিয়ে গেল - হ্যালো কে? ও আচ্ছা। আসতে দাও।

[তিন]

ও মা কী দারুণ! আজকে বারান্দায় এতগুলো প্রজাপতি এসেছে! লাল প্রজাপতি! নীল প্রজাপতি! আচ্ছা সবুজ রঙের প্রজাপতি কি পাওয়া যায়? একা একা ভাবে অর্পা। বাহ খেয়ালই তো করিনি- আমার গোলাপ গাছটা এত বড় হয়ে গেছে! প্রায় বাবার লাগানো গাছটার সমান! আমারটা ছোট, বাবারটা বড়। ছোট গাছ, বড় গাছ। বাহ বিপরীত শব্দ হয়ে গেল তো! কালকে তো এটাই হোমওয়ার্ক। যাক একটু প্রাকটিস করি। ছোট-বড়, লম্বা-খাটো, মোটা-

চিকন... বৈধ... ওহ- হো এটার বিপরীত শব্দটা কি যেন? কি যেন? দুর মনেই পড়ছে না। ধ্যাত! যাই মাকে জিজ্ঞাসা করি!

- মা, মা দরজা খোল। খোল।

খুব বিরক্তি নিয়ে অর্পণ দরজা খুলতেই অর্পা বলল,পেয়েছি আংকেল, অবৈধ!

ভূমিকম্প

আজকে শাম্মির রেস্ট ডে। তাই সে আজ ল্যাবে যায়নি। সকাল থেকে ফেসবুক গুতাগুতি করে আর ভালো লাগছে না। কোন ফ্রেন্ডই এখন অনলাইনে নাই। কি করা যায়! সোহেলকে একটা ফোন দিলে কেমন হয়! কিন্তু তার এই রোবোটিক জামাইটা যে অফিস টাইমে পার্সোনাল কোন কল রিসিভ করে না তা সে খুব ভালো করেই জানে। তারপরও দেখা যাক না কি হয়! শাম্মি সোহেলকে রিং করল। কিন্তু যথারীতি বাংলাতে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। জাপানি ভাষাতে এক মহিলা যা বলল তার মানে হল, যাকে কল দিয়েছেন তিনি ব্যস্ত থাকায় ফোনটি ধরেননি, চাইলে ভয়েস এসএমএস দিয়ে রাখা যেতে পারে! ধ্যাত!

শাম্মির মেজাজ খারাপ হয়! এক মিনিট কথা বললে কি এমন দোষ হত! আবার পরক্ষণেই ভাবে, জাপানিরা চরম কাজ পাগল! তাই সোহেলরই বা দোষ কি! অফিস টাইমে ব্যক্তিগত কথা বলতে দেখলে জাপানি বস ওকে সাইজ করে দেবে! থাক বাবা দরকার নেই! সময় মতো অফিস শেষে বাসায় ফিরলেই হবে!

হঠাৎ শাম্মির সেল ফোনটা বেজে উঠলো। আজব! সোহেল অফিস টাইমে কল ব্যাক করেছে! রোবোটের মাঝে দেখি প্রাণের সঞ্চার হয়েছে!

শাম্মি বলল, হ্যালো সুইট হার্ট কি কর? আমার কিছু ভালো লাগছে না। তুমি কখন আসবা?

- আসব না! ফোন দিসো কেন?

- আমার জানটার খবর নিবার জন্য! সেই সকাল থেকে আমার জানটাকে দেখি না! মিস ইউ!

- কি বলে! অফিসে এসেছি মাত্র এক ঘণ্টা হয়েছে!

- তোমার কাছে মাত্র এক ঘণ্টা! কিন্তু আমার কাছে এ যেন এক অনন্তকাল! সুইটি আজকে অফিস করা লাগবে না। চলে আস না! তোমার বসকে বল শরীর ভালো লাগছে না। একটা সিক লিভ মেরে দাও না! এত কাজ করে কি হবে!

- দ্যাখো আমার এখন ঢং করার সময় নাই! ওয়াশ রুমে ঢুকে কথা বলছি। ফোন রাখ।

- না রাখব না। রাখব না। রাখব না। তুমি আমার সাথে খারাপ বিহেভ করছ! যাও আজকে বাসায় রান্না বন্ধ। রাতে না খেয়ে থাকবে। এটাই তোমার শাস্তি!

- এইরে সেরেছে! সরি ডিয়ার! সরি।

- খালি সরিতে হবে না। আমাকে একটা পাপ্পি দাও।

- পাপ্পি! কিভাবে? ফোনে!

- হ্যাঁ! দিবা কি না বল!

- ওকে দিচ্ছি বাবা দিচ্ছি!

সোহেল শাম্মির রাগ ভাঙাতে পারল কি না জানি না তবে এরপরই শাম্মি রান্না করতে গেল! আজকে সে সোহেলকে ওর সব পছন্দের ডিশগুলো খাওয়াবে! গত দুই বছর যাবত এই টোনাটুনির সংসার টোকিওতে এভাবেই কাটছে!

[দুই]

সকালের রঙিণ সূর্যটা যে বিকেলে এতটা রংচটা হবে তা শাম্মি ভাবতেও পারে নি। যেন জোরে ঘুরে ওঠা পৃথিবীতে সে এতক্ষণ ঘোরের মধ্যে ছিল! নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। টেবিলের উপর থেকে ফুলদানিটা পড়ে ভেঙে গেল। সব আসবাব, সমস্ত ঘর এমনভাবে দুলছিল যেন এগুলো সব কাগজের তৈরি! এক দৌড়ে শাম্মি রাস্তায় বের হয়ে আসল। চোখের সামনে রাস্তাটা চির চির করে ফেটে যেতে লাগল! কালবৈশাখী ঝড়ে সুপারী গাছগুলো যেমনি অসহায়ভাবে দোলে আশেপাশের বাড়ি-ঘরগুলোকে শাম্মির তেমনই অসহায় মনে হচ্ছিল!

একটু পরে প্রকৃতির তান্ডব কিছুটা থেমে আসলে বাসার ভিতরে গিয়ে তার চোখ দুটো জলে ভিজে আসল। সব এলোমেলো, ভেঙে খানখান! বিদ্যুৎ চলে গেছে। মোবাইলে সোহেলকে এতবার কল দিল কিন্তু কলই ঢুকছে না। খুব কান্না পাচ্ছে তার। নিজেকে খুব অসহায় লাগছে। কি করবে সে এখন! হঠাৎ সে দেখল ল্যাপটপটা টেবিল আর খাটের মাঝে পড়ে ঝুলছে। এখনও ওটার চার্জ শেষ হয়নি। দৌড়ে ওটা তুলে নেটে ঢোকার চেষ্টা করল শাম্মি। যাক নেটলাইন এখনও আছে। তাড়াতাড়ি ফেসবুকে সোহেলের ওয়ালে লিখল, তুমি কোথায়? কেমন আছ? তোমাকে তো ফোনে পাচ্ছি না। আমি খুব টেনশনে আছি।

এরইমধ্যে জাপানের ভূমিকম্পের খবর সারাবিশ্ব জেনে গেছে। শাম্মি দেখল বাংলাদেশ থেকে অনেকেই তার ফেসবুক ওয়ালে তাদের খবর জানতে চেয়েছে। সে সবার কাছে দোয়া চাইল। ও আল্লাহ! আবার ঘর নড়তে শুরু করেছে। সে দৌড়ে বাইরে চলে গেল।

নাহ্ এবার বেশিক্ষণ কম্পন থাকল না। আসলে এটা হচ্ছে আফটার শক। জাপানে বড় যেকোন ভূমিকম্পের পর এমন হালকা কম্পন একটু পর পর চলতে থাকে। তিন চারদিন থেকে এক সপ্তাহ পর্যন্ত এমনটা হতে পারে।

শাম্মি এবার যেন একটু বেশি অস্থির হয়ে গেল। একবার সেল ফোন, একবার ফেসবুক। নাহ কোনোভাবেই সোহেলকে পাওয়া যাচ্ছে না। কি করবে? এখন সে কি করবে? সোহেলের অফিসের দিকে যাবে? হ্যাঁ তাই যাব! শাম্মি ঘরের দরজা পর্যন্ত যেতেই মোবাইলটা বেজে উঠল। রিসিভ করতেই কাঙ্ক্ষিত কণ্ঠস্বর, শাম্মি, আমি সোহেল। আমি ঠিক আছি। তুমি ঠিক আছ তো?

শাম্মির চোখে আনন্দে জল চলে আসে।

ফার্স্ট লাভ

- কেন ডেকেছ?

- তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছিল।

- তাই নাকি? দেখা তো হয়েছে এখন আমি যাব। আর কিছু বলবা?

- ছোটন, আই এম সরি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

এ কথা বলেই রাইসা ছোটনের হাতটা ধরল। সাথে সাথে ছোটন এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল। অথচ এই হাত ধরার জন্য সে এক সময় কত পাগল ছিল। তীব্র রোদে পুড়ে কিংবা বর্ষায় কাক ভেজা হয়ে কতদিন সে ছুটে গেছে রাইসার কাছে -শুধু তার হাতটা ধরবে বলে! কিন্তু মজার ব্যাপার ছিল, সামনা সামনি হলে সে যেন স্ট্যাচু হয়ে যেত। শুধু তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। তেমন কিছু বলতে পারত না, কিছু করতে পারত না। এমন কি এক সাথে রিকশায় ঘোরার সময়ও সে মুগ্ধ নয়নে রাইসার দিকে কেবল তাকিয়েই থাকত।

রাইসা আবার বলা শুরু করে, আমি জানি আমি তোমার সাথে চরম অন্যায় করেছি। আমি এখন বুঝতে পারছি আমি জীবনে কি ভুলটাই না করেছি। প্লিজ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

- তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছ? আমার কাছে? আজিব!

- আমি জানি, তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে আমার বাকি জীবনটা ভাল কাটবে না।

- কেন কাটবে না! জীবনে যা চেয়েছ তা-ই তো পেয়েছ! কি যেন নাম ছেলেটার... ওই যে যাকে নিয়ে তুমি নতুন করে ভেবেছিলে... জানো তোমার সেই এসএমএসটা আজও আমার মোবাইলে আছে... তুমিই তো বলেছিলে আমি জানি না কিভাবে ভালোবাসতে হয়... তোমার সে জানে... সে তো তোমারই আছে। আমাদের এতদিনের জানা-শোনা যার জন্য তোমার কাছে ফিকে হয়ে গেল... তাহলে তোমার এত কষ্ট কিসে?

- আমি জানি তুমি আমার উপর অনেক রেগে আছ? কিন্তু আমি ভুল করেছি। ও ছিল একটা প্রতারক। চিট! আমি তা অনেক পরে বুঝতে পেরেছি! ও আমার সব শেষ করে দিয়েছে! আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

রাইসা কাঁদতে শুরু করে।

কি হবে এতদিন পর মাফ করে! ছোটন আর রাইসার কাছে দাঁড়ায় না। সে চলে যায়। পেছনে পড়ে থাকে রাইসা।

ছোটনের খুব ইচ্ছা করে শুধু একবার, শুধু একবার প্রিয় মুখটা পিছনে তাকিয়ে দেখে। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে তাকে বলে, রাইসা আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। এতটা আমি নিজেকেও বাসি না।

কিন্তু ছোটন ফেরে না...।

বিকেল পাচটা

প্রতিদিন বিকেল ঠিক পাঁচটায় রবি বাসা থেকে বের হয়। ঘড়ির কাঁটা পাচটা ছুঁলে বাসার ভিতর তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। বাসাটাকে কারাগারের মত মনে হয়। অসম্ভব অস্থির হয়ে ওঠে সে। যেন তার অক্সিজেন নিতে কষ্ট হয়! তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বের হয় সে। লক্ষ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকে। মোড়ের দোকানে এসে একটা সিগারেট কেনে। সিগারেটটা জ্বালিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকে। সিগারেটটা জ্বলে যতই ছাই হতে থাকে তার হাঁটার গতিও ততই কমতে থাকে। একসময় সে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। একই রকম ভাবে প্রতিদিন। সূর্য আস্তে আস্তে হেলে পড়তে থাকে। রবি ঝিম মেরে বসে থাকে আর ভাবে...।

দুই বছর আগের কথা।

বাসা থেকে খুব সেজেগুজে রবি বের হচ্ছে দেখে বৌদি বললেন, কি ব্যাপার কই যাচ্ছ? আর তর সয় না, তাই না?

- কি যে বল না বৌদি!

আগামী মাসের দশ তারিখ রূপার সাথে তার বিয়ে। পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ে ঠিক হলেও রূপার সাথে তার জানাশোনা আট বছরের। না, ওদের মাঝে প্রেম ছিল না। তবে ভাল বন্ধুত্ব ছিল। আসলে পাশাপাশি বাসা থাকলে যেমনটা হয়। হঠাৎ করে রবির বাবার ইচ্ছেতেই ওদের বিয়েটা ঠিক হয়েছে। আজ বিকেল পাচটায় রূপার সাথে দেখা করার কথা। তারপর শপিং করবে। পূজা দেখবে। একসাথে ঘুরবে, খাবে। বিশাল প্রোগ্রাম ওদের।

- তোমার আসতে এত দেরি হল! আমরা কখন ঘুরব আর কখনই বা শপিং করব? রবির দেরি দেখে ক্ষেপে যায় রূপা।

- আরে একটু দেরিই তো ভাল। রাতেই তো পূজা দেখার মজা!

আজ বিজয়া দশমী। দুর্গা পূজার শেষ দিন। তাই মন্দিরে মন্ডপে লোকের অভাব নেই। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে সবাই মন্ডপের সামনে যাবার চেষ্টা করছে।

এত ভিড় দেখে রূপা বলল, থাক ভেতরে যাবার দরকার নেই; আমরা এখান থেকে মাকে প্রণাম করে চলে যাই।

- কি যে বল না; বিয়ের আগে প্রথম পূজাতে মাকে কাছে না গিয়ে কিভাবে আশীর্বাদ নেই?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিড়ের মধ্যে গেল রূপা। রবি সামনে সামনে যেতে থাকে আর তার হাত ধরে পেছন পেছন এগুতে থাকে সে। হঠাৎ সে অনুভব করে কে যেন পেছন দিক দিয়ে তার বুকের উপর হাত দিয়েছে। সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায় তার। ঘুরেই হাতের পাঁচ আঙুলের ছাপ বসিয়ে দেয় বদমাশটার গালে।

- যা হারামজাদা তোর মায়ের গায়ে হাত দে!

রাগে কাঁপতে থাকে রূপা! রবি শার্টের কলার ধরে বখাটেটাকে ঘুষি মারতে থাকে। এরই মাঝে পুলিশ চলে আসে। আর এক মুহূর্তও ওরা ওখানে দাঁড়ায় না। মায়ের আশীর্বাদ নিতে গিয়ে অসুরের অপচ্ছায়া দেখে বেশ বিমর্ষ হয়ে পড়ে দু'জনে। কিন্তু ওরা জানে না যে অসুরের অপচ্ছায়া তখনও ওদের পিছু ছাড়েনি।

রিকশাতে কারোর মুখে কোন কথা নাই। দুজনেই একদম চুপ। জড়তা ভাঙল রবি, সরি। তুমি ভেতরে যেতে চাওনি, আমার জন্যই...। সরি।

- বাদ দাও। চল আজকে আর ভাল লাগছে না। আমাকে বাসায় দিয়ে আস।

রিকশা এগিয়ে যেতে থাকে। আস্তে আস্তে মন্দিরের ঢাকের শব্দ হাল্কা হয়ে আসতে থাকে। কানে ভেসে আসে, ইয়া দেবি সর্বভুতেশূ নমঃতশ।

আকাশে মেঘ করেছে। একটু পর পর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাতাসের তিব্রতাও কম নয়। হঠাৎ ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বাতাস বৃষ্টি মিলে রিকশার গতি যেন অর্ধেক হয়ে গেল। রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে। রিকশাটা রূপাদের বাসার গলির মুখে পৌঁছতেই একটা মাইক্রোবাস এসে ওদের পথ আটকাল। কয়েকটা ছেলে এসে রূপাকে টেনে হিঁচড়ে মাইক্রোবাসে তুলে নিল। ওদের বাধা দিতে যেয়ে মাথায় শক্ত কিছুর বাড়ি খেল রবি। বিজলির আলোয় একটা পাংশু মুখ বলে, মর শালা! আরে এ তো সেই বখাটে! তারপর রবির আর কিছু মনে নেই।

তারপর রূপাকে খুঁজে পাওয়া যায় নাই।

হাসপাতাল থেকে ফেরার পর রবির প্রতিটা বিকেল এভাবেই কাটে।

লুঙ্গি সন্ত্রাস!

সম্ভবত নিয়মিত লুঙ্গি পরে এমন লোকদের মাঝে এমন কেউ নেই যে জীবনে অন্তত একবার হলেও লুঙ্গি সন্ত্রাসের শিকার হয়নি! বিশেষ করে যেসব ছেলেরা হলে থেকেছে তাদের জীবনে এটা অনেকটা ডাল ভাতের মতই জিনিস। ঘটনাটা ভার্সিটি লাইফের প্রথম দিকের। আমি তখনও হলে সিট পাইনি। ভার্সিটির পাশে একটা বেসরকারি হোস্টেলে ভাড়া থাকি। একসময় আমার মত আরও বেশ কিছু ছেলে এখানে এসে পুরো হোস্টেল ভরে ফেলল। দেশের নানান জেলা থেকে এসেছে ওরা। একেক জন একেক রকম! প্রথম প্রথম আমরা একজন আর একজনের প্রতি নম্র ভদ্র আচরণ করতাম। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকল আমাদের ঘনিষ্ঠতা ততই বাড়তে লাগল। আর সাথে সাথে বিপত্তিও বাড়তে লাগল!

হয়ত দেখা গেল একা একজন বারান্দায় লুঙ্গি পরে হাঁটাহাঁটি করছে। হঠাৎ করে দুই একজন এসে ওর লুঙ্গির গিট্টু ধরে টান মেরেই দে ছুট! কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেচারার দফা রফা! আমাদের মধ্যে দুই একজন বাঁদর টাইপের ছেলেরাই (লুঙ্গি সন্ত্রাসি!) এই কাজটা করত! সাধারণত লুঙ্গির নিচে কেউ কিছু পরে না। কিন্তু আমাদের ওখানকার পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল যে ছেলেরা রুমের বাইরে বের হলে লুঙ্গির নিচে হাফ প্যান্ট বা অন্য ছোটোখাটো কিছু পরা শুরু করে দিল!

যাই হোক। একদিনের ঘটনা বলি। তখন রাত আটটা বাজে। রুম থেকে বের হয়ে দেখলাম দুটো লুঙ্গি সন্ত্রাসি লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমার খুব কাছাকাছি রুম থেকে আমাদের সাথের এক ছেলেকে দেখলাম রুম থেকে বের হয়ে পিছন ফিরে দরজা লাগাচ্ছে! এই ছেলেটা একটু অন্য টাইপের মানুষ! গোল ফ্রেমের চশমা পরে। নাকের নিচে মোটা গোঁফ নিয়ে ঘোরে। বিড়বিড় করে একা একা কথা বলে। মাঝে মাঝে সে হঠাৎ করে স্ট্যাচু হয়ে যেত, নড়তে পারত না। আমরা কেউ তাকে ছুঁয়ে দিলে তবে সে নড়তে পারত। এই কাজের ব্যাখ্যায় সে বলত কেউ একজন আছে যে তাকে এমন করতে বলে! কিন্তু কে, সে তা বলত না। এই আজব আচরণের জন্য একজন ওর নাম দিয়েছিল মহাজাগতিক প্রাণি!

এবার আসল গল্পে আসি। তো মহাজাগতিক প্রাণি পিছন ফিরে রুমের দরজা লাগাচ্ছিল। এরি মধ্যে ওই দুই লুঙ্গি সন্ত্রাসির চোখে পড়ে গেল তার লুঙ্গি! আর যায় কই! চিলের মত ছোঁ মেরে ওর লুঙ্গির গিট্টুতে টান মেরেই দুই সন্ত্রাসির পলায়ন! পায়ের নিচে ঝুলন্ত লুঙ্গি পরা মহাজাগতিক প্রাণির এমন আবির্ভাবে আমরা যেন স্ট্যাচু হয়ে গেলাম! নির্বাক আমাদের সবাক হবার সম্ভাবনা তখন কমে গেল যখন দেখলাম মহাজাগতিক প্রাণি নড়তে পারছে না; আর আমাদের বলছে, এই আমি লুঙ্গি পরতে পারছি না। তোমরা কেউ আমাকে এটা পরিয়ে দাও!

এই সেরেছে! ও নিশ্চয়ই ওর সেই একজনের কাছ থেকে লুঙ্গি পরার অনুমতি পাচ্ছে না। বিপদ! এ যে মহাবিপদ! এভাবে পাঁচ মিনিট চলে গেল। এর মধ্যে একজন লুঙ্গি সন্ত্রাসির মনে মায়া হল। সে এসে লুঙ্গি পরিয়ে মহাজাগতিক প্রাণিকে করুণ দশা থেকে মুক্ত করল!

বলাবাহুল্য এরপর লুঙ্গি সন্ত্রাসিদের অপতৎপরতা কিছুটা হলেও কমেছিল!

হিমেল তোমার জন্য

ঘড়িতে এখন দুপুর দুইটা বাজে। আর মাত্র ত্রিশ মিনিট পর অফিস ছুটি হবে। তিনদিনের টানা ছুটি -ঈদের ছুটি। সবাই একটু পর পরই ঘড়ি দেখছে। ত্রিশ মিনিট যেন বড় দীর্ঘ সময় - কাটতেই চাচ্ছে না। মতিন সাহেব তো বলেই বসলেন, 'কি ব্যাপার আজ ছুটির সময় হবে না নাকি? কতদিন পর বাড়ি যাব জানেন? ছোট বাবুটা হয়েছে সে-ই কবে, আজও কোলে নিতে পারিনি।'

সদ্যবিবাহিত নিতাই বাবু বললেন, 'বুঝছেন দাদারা, চারটার বাসে যাচ্ছি। পূজোয় তো যেতে পারিনি। তাই এবার যাচ্ছি। মা যে আমার কেমন আছে?'

রসিক ভদ্রলোক ইসমাইল সাহেব। তিনি মজা করতে ছাড়লেন না -'বুঝি রে নিতাই, সবই বুঝি। নতুন বউকে দূরে রেখে মায়ের নাম নিয়ে বাড়ি যাওয়া! লজ্জার কি আছে? আহা, বল না বউটারে কতদিন দেখি না...!'

আমার কোন তাড়া নেই। অফিস যখন ছুটি হবার হোক। আমাকে দৌড়ে দেশের বাড়ির বাস ধরতে হবে না। মনে পড়ে এই তো গতবছরও কি কষ্ট করে বাঁদুরঝোলা হয়ে বরিশাল গিয়েছিলাম। কষ্ট হচ্ছিল, তবুও ভাল লাগছিল এই ভেবে যে, নিজের দেশে যাচ্ছি; যেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে বাবার স্নেহ, মায়ের ভালোবাসা আর বুবুর আদর! অথচ আজ মাত্র এক বছরের ব্যবধানে সবাই কেমন যেন বদলে গেল। একদম ভুলে গেল? আমি কি খুব বড় ধরনের অপরাধ করেছি? যাকে ভালোবেসেছি তাকে বিয়ে করেছি। তোমরা কেন যে রাজি হচ্ছিলে না? ভালো মেয়ে হিসেবে হিমেল কোন অংশে কম ছিল?

শুধু নিজের কথাই বলে যাচ্ছি। আমার বাবা-মা তো অনেক দূরে থাকেন। কিন্তু ওর বাবা-মা এ শহরেই থাকেন। মাঝে মধ্যে রাস্তাঘাটে দেখাও হয়ে যায়। তারা মুখ ফিরিয়ে নেন। প্রথম প্রথম হিমেল এ বিষয়টা নিয়ে ভীষণ মন খারাপ করত। খুব কাঁদত। আমরা যে দু'পক্ষকে বোঝানোর চেষ্টা করিনি তা কিন্তু নয়। যতবার তাদের কাছে গিয়েছি ততবারই উনারা তাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন আমাদের পৃথিবীতে কেবল আমরা দুজন□ আমি আর হিমেল।

আমার বউটা নামেও হিমেল, আচরণেও হিমেল। একদম ঠান্ডা মেজাজের চুপচাপ। শুনেছি ছোটবেলায় শান্ত স্বভাবের জন্য ওর খালা ওর নাম রেখেছিল হিমেল। পৃথিবীতে কেবল এই মানুষটিই আমাকে বোঝে। আমার পাখির বাসার মত বাসায় জানি ওর খুব কষ্ট হয়। আমি ওর কোন চাওয়াই পূরণ করতে পারিনি। দিতে পারিনি একটা ভাল শাড়ি। তবুও ওর মুখে আজ পর্যন্ত আমি কোন হতাশা শুনিনি, আফসোস দেখিনি। আসলে বিধাতা যা করেন ভালোর জন্যই করেন। ও যদি পাশে না থাকত সত্যিই এতদিনে আমি মরেই যেতাম!

কখন যে সন্ধ্যা গড়িয়ে বেশ রাত হয়ে গেছে - হাঁটতে হাঁটতে টেরই পাইনি। ঢাকা শহর এখন প্রচণ্ড ব্যস্ত। লোকজন শুধু ছুটছে আর ছুটছে। মার্কেটগুলোতে উপচে পড়া মানুষের ভিড়। লোকজন শুধু কিনছে আর কিনছে। একজনকে

দেখলাম এত বেশি কিনে ফেলেছে যে জিনিসের ভারে হাঁটতে পারছে না। অদ্ভুত নগর এ ঢাকা! কারো কারো পকেটে এত বেশি টাকা... আবার কারো বা একদম পকেট ফাঁকা।

এটা আমার সংসার জীবনের প্রথম ঈদ। আমার খুব ইচ্ছে করছে সোনা-দানা, দামি শাড়িতে হিমেলকে মুড়িয়ে ফেলি। কিন্তু কিছুই করতে পারি না। আমার মত মানুষের কেবল স্বপ্নই থাকে। সাধ আছে অথচ সাধ্য নেই। নিজেকে এত তুচ্ছ মনে হচ্ছে!

- কি ব্যাপার আজ এত দেরি করলে? দরজা খুলেই জিজ্ঞেস করে হিমেল।

- না এমনিই।

- ও আচ্ছা। হাতমুখ ধুয়ে নাও খেতে দিচ্ছি।

- হিমেল আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।

- জানি তো। কিন্তু হঠাৎ এভাবে বলছ?

- আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি তোমার এমনই অথর্ব হাজবেন্ড যে তোমাকে ঈদে কিছুই দিতে পারছি না। অথচ এটা আমাদের সংসারের প্রথম ঈদ।

- আরে বাবা সময় তো শেষ হয়ে যাচ্ছে না। এবার পারছ না পরেরবার পারবে। তাছাড়া আমিও তো তোমাকে কিছুই দিতে পারিনি। তুমি এভাবে বললে তো আমারও মন খারাপ হয়।

- হিমেল তুমি এত ভাল কেন? আমি তোমাকে খুব খুব ভালোবাসি।

আজ রাতের আকাশের চাঁদটা একটু আগেও বিষন্ন মনে হচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে এ বিষন্নতার মাঝেও আনন্দ আছে... কেবল খুঁজে নিলেই হয়!

খেলা

- দোস্ত দ্যাখ দ্যাখ! খেলা শুরু হইছে!

- কই?

- দূর বাল! তুই একটা কানা! কিছুই দেখস না!

- না মামা এইবার দেখছি। ইস... ধরছে তো...

- উহ শালা! শাড়িটা খুলে ফেলছে...

- মামা আমার সব খাড়াইয়া যাইতাছে... মাথার চুল থেকে গায়ের লোম... সব... আমি নিজের চোখরে বিশ্বাস করতে পারতাছি না...

- চুপ থাক। আগে দেখি আজকে কি করে...

ঢাকা শহরের পাশাপাশি ফ্ল্যাটগুলোর এই এক মহামারি সমস্যা! এক বাসার জানালা থেকে আরেক বাসায় তাকালে অনেক কিছুই দেখা যায়। অবশ্য স্বভাবগত কারণে ব্যাচেলরদের মধ্যে এই উঁকিঝুঁকি মারার প্রবণতা বেশি থাকে। পান্থদের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপারটা ঘটেছে। কিন্তু এ বিষয়ে ওদের দোষ পুরোটা দেয়া যাবে না। গভীর ভালবাসাবাসির আগে দরজা বন্ধ আছে কিনা, কিংবা জানালার উড়ন্ত পর্দা দুষ্টুমি করছে কিনা -সেটা সবারই খেয়াল রাখা উচিৎ। কেননা নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ থাকবেই।

গত প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে একই চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে পান্থ আর ছোটন। চোখের সামনে এমন পর্ণো মুভি দেখার সুযোগ খুব একটা পাওয়া যায় না! কিন্তু ওদের এমন অতি আগ্রহের ভার নিতে হঠাৎ যেন বাধ সাধল চেয়ার! দড়াম! গেল চার পায়ের এক পা! একজন আরেকজনের গায়ে পড়ে ওরা যতটা না ব্যথা পেল তার চেয়ে বেশি ভয় পেল যখন দেখল, পাশের ফ্ল্যাটের আদিম নরনারীর দুইজনই ওদের দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে!!

আধা ঘণ্টা পর...।

ছোটন বলল, পান্থ দ্যাখ তো এত জোরে জোরে কোন শালায় দরজা ধাক্কায়!

- দেখতাছি!

দরজা খোলার শব্দ হল। আর রে এত সেই লোকটা! একটু আগে দেখা আদিম নরনারীর নর! ওরা কিছু বলার আগেই লোকটা শুরু করল, হারামজাদা! কুত্তার বাচ্চা! খানকির পোলা!...

পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল এটা বেশ বুঝতে পারল ছোটন। কিন্তু সে ঘটনা সামলানোর চেষ্টা করল। ছিঃ ছিঃ! কে আপনি! এভাবে কথা বলছেন কেন?

- তাইলে ক্যামনে বলবে! তোদের চুমা দিয়া কইতে হবে! শুয়োরের দল!

- আজব!

লোকটার চেঁচামেচিতে এরই মধ্যে অনেক লোক জমে গেছে!

- কি হয়েছে ভাই? কি হয়েছে? চালাকিটা করল পান্থ! সে জানে লোকটা কিছুই করতে পারবে না। সে বলল, ভাই, আপনি এত রেগে আছেন কেন? বসেন। ঠান্ডা হন। আমাদের অপরাধটা কি? সব কিছু সবার সামনে খুলে বলুন। তারপর আমরা অন্যায়কারি হলে শাস্তি তো দিবেনই!

ওষুধে বেশ কাজ হল! লোকটা সবার সামনে কিছুই বলতে পারল না। গালাগালি করতে করতে এক সময় চলে গেল।

এক টিকিটে দুই ছবি!!!

আমি সব সময়ই স্বীকার করি যে খুব ছোটকাল থেকেই নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আমার আকর্ষণ দুর্নিবার! আর এই অযাচিত মানসিকতার জন্য কৈশোরে আমাকে টুকটাক পাপ (!) করতে হয়েছে! কিন্তু এমন কাজ করা মোটেই ঠিক না। আমি আমার সন্তানকে এমন কখনোই করতে দেব না!!! যাই হোক, এবার আসল ঘটনায় আসি।

যত দূর মনে পড়ে তখন আমি ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। থাকি বরিশালে। একদিন বিকেলবেলা। বটতলা পুরান পাসপোর্ট অফিসের সামনে আমি, রাকিব আর বাপ্পি দাঁড়িয়ে! হাতে তেমন কোন কাজ নেই। রিকশায় মেয়ে দেখা ছাড়া কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ বাপ্পি বলল, চল একটা এক টিকিটে দুই ছবি মেরে আসি!

রাকিব বলল, তুই এসব কি বলছিস?

আমি তো ভয়ই পেয়ে গেলাম! বললাম, নারে! আমার এত সাহস নাই! বরিশালে সবাই সবাইকে চেনে। কোনভাবে যদি আম্মার কানে যায়! খবর আছে আমার! আমি যাব না।

আমাদের কথা শুনে বাপ্পি কেমন যেন দমে গেল!

ঘণ্টাখানেক পর...।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা সদর রোডে চলে এলাম। তখন বরিশালে কাকলি নামক একটা সিনেমা হল ছিল। সেখানে সব হট হট (!) বাংলা ছবি দেখানো হত। ওই হলের সামনে এসেই বাপ্পি আমাদের খোঁচাতে শুরু করল! চল। ঢুকে পড়ি। পোস্টার দেখে মনে হচ্ছে পয়সা উঠে যাবে!

সেদিন জীবনে দুইটা প্রবাদবাক্যের সত্যতা হাতে নাতে পেলাম -

১. অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা!

২. সংগদোষে লোহা ভাসে!

সিনেমা হলের আলো আঁধারি পরিবেশ আমাদের খুব একটা খারাপ লাগছিল না। তদুপরি নায়িকার বার বার পানিতে ভেজার অপচেষ্টা দেখে দেখে চারপাশ বেশ গরমই (!) লাগছিল। যতদূর মনে পড়ে ছবিটার নাম ছিল ০০৭ টাইপ একটা কিছু! তো আমরা ছবি দেখছি! এক দৃশ্যে দেখা গেল, নায়িকা পানিতে ডুবে গেল আর নায়ক তাকে তুলে এনে মাটিতে শোয়াল। সাধারণত কেউ পানিতে ডুবে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে তার পেটে চাপ দিয়ে পানি বের করা হয় বা তাকে শ্বাস দেবার চেষ্টা করা হয়। অথচ এখানে দেখলাম, নায়ক প্রাথমিক চিকিৎসার নাম করে নায়িকার গায়ের জামা কাপড় সব খুলে ফেলল... তারপর... হিশ হিশ...

একটু পরে রাকিবের হালকা আওয়াজ শোনা গেল, পয়সা উঠে গেল রে... !

তৃপ্তিকর (!) অনুভূতির বিনাশ হবার আগেই আমাদেরকে এক ভয়ানক আতঙ্ক চেপে ধরল যখন হঠাৎ দেখলাম আমাদের পাশে বসা লোকটি নেই কিন্তু তার জায়গাতে একটা ব্যাগ পরে আছে! ওরে আল্লাহ! বোমা নাতো! উল্লেখ্য ওই সময় দেশের অনেক সিনেমা হলে বোমা হামলা হয়েছিল!

আমাদের তো কলিজায় তখন পানি নেই! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম, হে খোদা এবারের মত বাঁচিয়ে দাও! আর জীবনেও এ পথে আসব না!

আল্লাহর অশেষ রহমত! দেখলাম একটু পর ব্যাগওয়ালা লোকটা চলে আসল। হয়ত হট সিন দেখে তার বাথরুম পেয়েছিল!!

এরপর সিনেমা শেষ না করেই আমরা হল থেকে বের হয়ে গেলাম! বলাবাহুল্য, সেই ঘটনার পর আজ এত বছর হল আমার আর হলে গিয়ে সিনেমা দেখা হয়নি!!!

প্রশ্ন

- দোস্ত কেমন আছো?

- ভাল।

- আরে ভাল তো থাকবেই শালায় নতুন বিয়ে করছে। এখন তো ওর ভাল থাকারই সময়।

- যাক ভাল থাকলেই ভাল। তা দোস্ত বিয়ে করলা কিন্তু আমাদের জানাইলাও না। আমরা অনেক মাইন্ড করছি।

- সরি দোস্ত। হুট করেই তো সব হয়েছে। তাই... সরি।

- আর সরি বলে কী হবে! যাক আমরা তোমারে এক শর্তে মাফ করতে পারি। বল রাজী কিনা?

সদ্য বিবাহিত নাজমুল বেশ বুঝতে পারছে আজ সে বন্ধুদের চিপায় পড়েছে। তার রক্ষা নেই।

- আগে তো বলবি শর্তটা কী?

- তোর বাসর রাতের গল্প বলতে হবে। কিছু লুকাতে পারবি না।

- শিট! কী বলিস এসব?

- শুরু কর। দেরি করিস না। দ্যাখ! আমরা তিনজন। আর তিনজনই ব্যাচেলর। না বললে কিন্তু তোর খবর আছে!

- বল। কি জানতে চাস?

একজন চোখ গোল গোল করে বলল, কনডম কিভাবে কিনেছিলি বল?

এটা একটা ভাল প্রশ্ন! বলল নাজমুল। ডিসপেনসারিতে গিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিছুতেই বলতে পারছিলাম না। শেষে সেল ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করলাম, ইউ অ্যান্ড মি! তারপর দোকানদারকে বললাম ভাই এই ওষুধটা আছে? খুব দরকার ছিল! ব্যাস পেয়ে গেলাম।

- তারপর?

- তারপর আর নাই।

- হারামজাদা। আমাদের সাথে ফাজলামি করস? বল রাতের কথা বল।

- কি বলব?

- কে জিতেছে? তুই না ভাবি? বল।

- কি সব যে বলিস না।

- আচ্ছা চিনিস না জানিস না এমন একটা মেয়ের সামনে তোর নেংটু পুটু হতে লজ্জা করল না??

- অচেনা কই? ও তো আমার বউ!

- হাহাহা! তার মানে তুই নেংটু হয়েছিলি! কথায় ধরা খাইছস!

নাজমুল চুপ করে থাকে। এবার তাকে ধাক্কা দিয়ে আরেক বন্ধু বলে, মামা, কোন ঝামেলা হইছিল? নাকি ভালোয় ভালোয় সব শেষ হইছে।

- একটা ঝামেলা হইছিল। কনডম ঠিক মত পরতে পারছিলাম না। উল্টা করে পরার চেষ্টা করেই দুইটা নষ্ট করে ফেলেছিলাম। আসলে অভিজ্ঞতা না থাকলে যা হয়!

- তুই কয় প্যাকেট নিয়া ঢুকছিলি। এক কার্টন নাকি?

- ধ্যাত। অনেক কইছি। আমারে এখন ছাড়।

- আঃরে দাড়া। মামা, কয়বার পারলা প্রথম রাতে? ডিউরেশান কতক্ষণ ছিল?

- মনে নাই।

- আররে মনে থাকব ক্যামনে ও তো হাঁপাইতে হাঁপাইতে কখন ঘুমাইয়া গেছিল যে নিজেই টের পায় নাই!

- অনেক হইছে। এখন বাদ দে। নিজেরা বিয়া কর। এমনিতেই সব জেনে যাবি।

- দোস্ত লাস্ট একটা জ্ঞানের কথা বল। মাস্টারবেশন আর রিয়েল সেক্সের মাঝে পার্থক্য কি?

- দুধের স্বাদ কি আর ঘোলে মেটে রে...!

বৈশাখী ঝড়!

দুপুরবেলা দরজা খুলতেই বৈশাখী এক দৌড়ে নিজের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মেয়ের এমন আচরণে ভীষণ অবাক হলেন রিপা রহমান। কি হল ওর! সকালে তো ভালভাবেই কলেজে গিয়েছিল! ফিরে এল আজ এত তাড়াতাড়ি! কোন পরীক্ষায় ফেল করল নাতো? কিন্তু তা কি করে হয়! এ বছর তো ওর একটাও পরীক্ষা হয়নি। তাহলে?

এক অজানা আতংকে রিপা রহমানের মনটা কেঁপে উঠল। তিনি দরজা ধাক্কাতে লাগলেন।

- এই বৈশাখী, মা আমার! কি হয়েছে তোর! দরজা খোল!

ভেতর থেকে কোন সাড়া নেই।

- বৈশাখী! বৈশাখী! লক্ষ্মী মা আমার! সোনা মা! দরজা খোল!

তিনি এবারও কোন সাড়া পেলেন না! এক অযাচিত ভয়ে তার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যেতে লাগল। কি করছে ভেতরে বৈশাখ!

দ্রুত বিকল্প চাবি দিয়ে দরজা খুলে তিনি যা স্বপ্নেও ভাবেননি তা-ই দেখলেন - সিলিং ফ্যানের সাথে তার মেয়ে ওড়না বাঁধার চেষ্টা করছে! বৈশাখী! চিৎকার করে একটা চড় লাগিয়ে দিলেন মেয়ের গালে! তুই কি পাগল হয়ে গেছিস?

ঘণ্টাখানেক পর...।

মা-মেয়ে মুখোমুখি বসে আছে। বৈশাখীর চোখ থেকে অঝোর ধারায় পানি পড়ছে! রিপা রহমান খুব আদর করে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, মা তোর কি হয়েছে? কেন এমন করছিস?

বৈশাখী কোন কথা বলে না। সে শুধুই কাঁদে।

রিপা এবার জিজ্ঞেস করেন, আমি বেশ বুঝতে পারছি তোর অনেক কষ্ট হচ্ছে। তোর মত এমন বয়স তো আমারও ছিল। মা আমাকে সব কিছু বল। কি হয়েছে?

- মা, আমি বলতে পারব না। তুমি রাগ করবে? অনেকক্ষণ পরে বৈশাখী কথা বলে।

- নারে সোনা, আমি রাগ করব না। আমাকে বলবি না তো কাকে বলবি। বরং না বললে আমি কষ্ট পাব!

বৈশাখী আবার চুপ করে থাকে। রিপা মেয়ের হাত ধরেন। বল, বলবি না? মেয়ের কষ্টে নিজের অজান্তে তারও চোখে পানি চলে আসে। মায়ের চোখে পানি দেখে এবার আর বৈশাখী চুপ থাকে না। সে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করে, মা, তুমি তো আমার বন্ধু সোহেলকে চিনতে?

- হাঁ চিনতাম।

- ও শুধু আমার বন্ধু ছিল না। ওর সাথে আমার তিন বছরের রিলেশান!

- তারপর?

- মা আমি আর বলতে পারব না। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে!

অসম্ভব ওজনের দুশ্চিন্তার ভারটি রিপা রহমানের বহন করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলেন। খুব আস্তে আস্তে বললেন, মা বৈশাখী, তুই এমন করছিস কেন? তোর যত কষ্টই হোক আমাকে বল। বলে হালকা হ!

- মা, সোহেল আমার সাথে চিট করেছে। ও আমাকে শেষ করে দিয়েছে।

- মানে কি? ও তোর সাথে আর রিলেশান রাখতে চাচ্ছে না?

- না।

- বাদ দে। ভুলে যা। কারোর জন্যই কোন কিছু থেমে থাকে না।

- কিন্তু মা, ও একটা অমানুষ! ও আমার সব শেষ করে দিয়েছে! একদিন ওদের বাসায় আমাকে নিয়ে গিয়েছিল ওর মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে বলে... কিন্তু ওদের বাসায় কেউ ছিল না... তারপর... তারপর... আমি আর বলতে পারব না।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে রিপা রহমানের। তবুও তিনি মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করেন।

- বৈশাখী, বল তারপর কি হয়েছিল? বল।

বৈশাখী কিছু বলে না। খালি কাঁদতে থাকে। রিপা রহমান বলতে থাকেন, বল তারপর কি হয়েছিল? বল। সোহেল কি তোর কাপড় খুলেছিল? বল।

বৈশাখী এবার উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকে। রিপা রহমান মেয়ের হাতটা শক্ত করে ধরেন। বললেন, চল।

সোহেল তার বাসার নিচে চায়ের দোকানে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। আজকে সিগারেটটা তার অনেক ভাল লাগছে। চোখ বন্ধ করে একটা সুখটান দিল। কিন্তু চোখ মেলে সে ধোওয়া ছাড়তে পারছিল না। সোহেল কিছু বুঝে ওঠার আগেই রিপা রহমান ঠাস করে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন, জানোয়ারের বাচ্চা! তোকে চড় মারতেও আমার ঘৃণা হয়। বৈশাখী চুপ করে আছিস কেন? মার ওকে! জুতো খুলে মার। মার। বলছি মার।

বৈশাখী এবার যেন বৈশাখী ঝড় হয়ে গেল!

থার্ড পারসন

[এক]

সকাল সাতটা বাজতেই এলার্ম দেয়া মোবাইলের আর্তচিৎকার। পড়ি-মরি করে বিছানা ছেড়ে মেসের প্রতিদিনের প্রতিযোগিতায় শামিল হওয়া -কার আগে কে টয়লেটে যাবে! একটু পর খবর এল, বুয়া আসেনি। কোন মতে হোটেলে নাশতা খেয়ে এক দৌড়ে ১২ নম্বর বাসে ঝুলে পড়া - মোহাম্মদপুর থেকে কাওরান বাজার। অফিসে ঢুকে বসের ঝাড়ি -এত দেরি কেন? এটা করনি কেন? ওটা কই? তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না! বিকেলে আবার সেই ১২ নম্বর, আবার বাদুরঝোলা, আবার মোহাম্মদপুর -এ এক অভিনব জীবনচক্রে জড়িয়ে গেছে মশিউলের জীবন। প্রতিদিনের একই জীবনচিত্র। কিচ্ছু ভাল লাগে না তার। এটা কোন লাইফ হল! টাকা নাই। পয়সা নাই। গাড়ি-বাড়ির তো প্রশ্নই আসে না! একটা গার্লফ্রেন্ড পর্যন্ত নাই। মেস মেম্বার নয়নের আছে প্রেমিকা, তপনের আছে ফোন-ফ্রেন্ড আর জয়ের তো কথাই নেই - প্রায়ই সে তার গার্লফ্রেন্ড নিয়ে এসে রুমের দরজা লাগিয়ে দেয়। কি করে ওরা ভিতরে বসে? সবার আছে। আমার নেই। সবার হয়। আমার হয় না কেন? প্রবলেমটা কোথায়?

[দুই]

- হুম তারপর বল।

- কি বলব? আসলে তোমার সাথে আমি এত এত কথা বলেছি যে আমার সব কথা মনে হয় ফুরিয়ে গেছে। আর আমার বলার চেয়ে শুনতেই বেশি ভাল লাগে। আচ্ছা তোমার একটা ফ্রেন্ড ছিল না ফরহাদ। মোবাইল কোমপানিতে চাকরি করত। ওর কি খবর?

- জানি না।

- এখন আর যোগাযোগ নেই?

- না, নাই। আর ওর কথা বাদ দাও। ফালতু কোথাকার!

- কে ফালতু আমি নাকি ফরহাদ?

- আররে তুমি তো আমার জান!

ফাহমিদার মুখে এ কথাটা শুনতে মশিউলের অসম্ভব ভাল লাগে। অবাকও লাগে। এত বড় লোকের মেয়ে! অথচ মশিউলকে এত কেয়ার করে! ফাহমিদার সাথে মশিউলের সম্পর্ক প্রায় ছয় মাসের। একদিন রাতে মেসের সবাই মোবাইলে ব্যস্ত। চুপচাপ বসে ছিল মশিউল। আর তা দেখে বোধহয় খুব মায়া হয়েছিল জয়ের। বলতে গেলে একরকম জোর করেই ফাহমিদার নম্বরটা মশিউলের হাতে ধরিয়ে দিল জয়। সেই থেকে শুরু। প্রথম প্রথম মশিউলই বেশি কল করত। এখন ফাহমিদাই করে। মশিউলের সাথে কথা না বলে ও একদম থাকতেই পারে না। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ওরা নানান জায়গায় ঘুরতে যায়। হাত ধরাধরি করে হাঁটে। একসাথে আইসক্রিম খায়। ফুচকা খায়। আস্তে আস্তে মশিউল অনুভব করতে শুরু করে -তার জীবনটা এখন আর কালারলেস নয়।

[তিন]

- কি ব্যাপার? কার সাথে কথা বলছিলে? প্রায় দুঘন্টা ধরে ট্রাই করছি।

- ও তাই। মশিউলের প্রশ্নের কেমন যেন নিসপ্রাণ জবাব দেয় ফাহমিদা। আচ্ছা আমার এখন ঘুম পাচ্ছে। তোমার সাথে পরে কথা বলি।

আস্তে আস্তে এ কথাগুলো মশিউলের জীবনে রুটিন ওয়ার্কে পরিণত হতে শুরু করে। কিন্তু ফাহমিদার আচরণে হঠাৎ এ পরিবর্তন কেন? এ ‘কেন’-র জবাব হঠাৎ একদিন পেয়ে যায় মশিউল বসুন্ধরা সিটিতে।

- মশিউল, এই হচ্ছে ফরহাদ। আর ফরহাদ এ হচ্ছে মশিউল। আমার খুব ভাল বন্ধু। বলল ফাহমিদা।

ফরহাদ হাত বাড়িয়ে দেয়, হ্যাঁ, আমি শুনেছি আপনার কথা। ইউ আর এ ভেরি নাইস পারসন!

- থ্যাঙ্ক ইউ।

একটুপর ওরা চলে গেল। মশিউল একা দাঁড়িয়ে রইল। ফরহাদ আর ফাহমিদা হাঁত ধরাধরি করে হাঁটছে। দেখতে খুব ভাল লাগছে। একজনের হাত আরেকজনের হাতে। নাহ এভাবে তাকিয়ে থাকা ঠিক না! ভাবে মশিউল। নিজেকে কেমন যেন থার্ড পারসন বলে মনে হয়।

ভিতর বাহির

[এক]

প্রতিদিন দুপুরবেলা মফিয মিয়াকে এখানে আসতেই হয়। শান্তিনগর মোড়। সারি সারি আকাশ ছোঁয়া দালান। ব্যস্ত রাস্তার দু’পাশে অসংখ্য দোকান। ছুটে চলা বাস, সিএনজির সাথে পাল্লা দিয়ে হেরে যায় রিকশাওয়ালারা। মফিয মিয়া তার ঠেলাগাড়ি নিয়ে অবশ্য কারো সাথে পাল্লা দিতে যায় না। চুপচাপ বসে থাকে সবচেয়ে বড় এপার্টমেন্টটার সামনে। সঙ্গী তার দশ বছরের ছেলে মতি। বাবাকে সে-ই ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। প্রায়ই

বাবার সাথে সুর মিলিয়ে গায়, দিনের নবী মোস্তফা, রাস্তা দিয়া হাঁইটা যায়, পাখি একটা বইসা ছিল গাছেরও ছায়ায়...।

- আম্মা একটা টাকা দিয়া যান গো। মাঝবয়সি এক মহিলাকে বলল মফিয মিয়া। কথা শুনেই মহিলা যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, এই ব্যাটা কি বললি? আম্মা মানে? কে তোর আম্মা? আপা বলতে পারিস না!

- ভুল হয়ে গেছে আপা। থতমত খেয়ে যায় মফিয মিয়া। একটা টাকা দ্যান গো আপা। মতি ঠিক বুঝতে পারে না যে কেন ঐ মহিলা তার বাবার উপর রাগ করল। সে তাই জিজ্ঞেস করল, বাবা উনি রাগ করল ক্যান?

- কি জানি! যত্তসব পাগল ছাগল! আসলে বড়লোক তো এদের ভাব বোঝা দায়! যখন খুশি ইচ্ছা রাগ করে, যখন খুশি হাসে।

- বাবা এরা খুব বড়লোক, না?

- কি কয় ছ্যামড়ায়! বলদ নাকি? এরা বড়লোক মানে বিশাল বড়লোক। তা না হইলে এত বড় বাড়িতে থাকে ক্যামনে? কি সুন্দর গাড়িতে চড়ে। কত রঙের ছোটবড় জামাকাপড় পরে।

- এনাগো জীবনডা খুব মজার, তাই না বাবা?

- হ রে বাপ খুব মজার।

- ওনরা কি প্রতিদিন পোলাও মাংস খায়?

- কি জানি খায় হয়ত! তোর কি খাইতে ইচ্ছা করতাছে?

মতি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

- ঠিক আছে চল। মফিয মিয়া তার ছেলেকে নিয়ে মালিবাগ মোড়ের দিকে পা বাড়ায়। ওখানে ছোট্ট এক দোকানে ‘দশ টাকা প্লেট’ বিরানি পাওয়া যায়। মফিয মিয়া জানে কিভাবে এ বিরানি তৈরি করা হয়। তবে তার ছেলে জানে না যে, বিভিন্ন কমিউনিটি সেন্টারের ফেলে দেয়া উচ্ছিষ্টের সমন্বিত রূপই এ বিরানি!

[দুই]

নয় তলার ফ্ল্যাটে থাকে তিশারা। ফ্ল্যাট নম্বর নাইন-বি। তিন বেড, ডাইনিং, ড্রইং, কিচেন - বিশাল ফ্ল্যাট। পাশে দক্ষিণের বারান্দা। প্রচুর আলো, প্রচুর বাতাস। কিন্তু এসব ভোগ করার লোক নেই বললেই চলে। এত বড় বাসায় বাসিন্দা মাত্র তিনজন, জামাল চৌধুরী, তার স্ত্রী মিথিলা চৌধুরী আর তাদের একমাত্র মেয়ে তিশা। এছাড়া তিনজন কাজের বুয়া আছে। তিশা এবার ও-লেভেল দিয়েছে। দিনের অধিকাংশ সময়ই সে বাসাতে একা একা থাকে। তার বাবা জামাল চৌধুরীকে সে জন্মের পর থেকেই দেখে আসছে ব্যবসা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। আজ ঢাকা তো কাল হংকং, পরশু জাপান, তার পরদিন বা অন্য কোথাও, তিনি ব্যবসার কাজে ছুটে বেড়ান। পাশাপাশি মিথিলা চৌধুরীও কম

যান না। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী। নানান সংগঠনের সাথে তিনি জড়িত। সকালে মিটিং, বিকালে সেমিনার, রাতে কোন না কোন পার্টি যেন তার পিছনে লেগেই থাকে।

- জীবনে তো অনেক সমাজসেবা করলে আর কত? বললেন জামাল চৌধুরী।

- মানে কি বলতে চাও তুমি? পাল্টা প্রশ্ন করলেন মিথিলা চৌধুরী।

- মেয়েটা সারাদিন একা একা থাকে। ওকে একটু সময় দাও।

- তুমি দিতে পার না? মেয়ে কি আমার একার নাকি?

- এটা কোন ধরনের কথা! তুমি না ওর মা!

- হাঁ, তুমি তো ওর বাবা।

- আমি তো বিজনেসে ব্যস্ত থাকি।

- আর আমি মনে হয় সারাদিন ঘোড়ার ঘাস কাটি?

- এমন ইডিয়টের মত কথা বলছ কেন?

- জামাল তুমি কিন্তু আমাকে গালি দিচ্ছ। ইউ রাসকেল...।

শুরু হয়ে গেল। পাশের রুম থেকে তিশা সব শুনতে পাচ্ছিল। অবশ্য এভাবে সে প্রতিদিনই শুনতে পায়। প্রতিদিন রাতেই একই ঘটনা। মাঝরাত... তর্কাতর্কি... গালাগালি... বাবার মদ গেলা... মায়ের চিৎকার... আর ভাল লাগে না। তিশা সিডি প্লেয়ারের ভলিয়্যুম বাড়িয়ে দেয়। রুমের লাইট বন্ধ করে মোবাইলটা হাতে নিয়ে বসে।

- হ্যালো ইফতি কি করছিস?

- ছবি দেখছি।

- কি ছবি?

- বলা যাবে না।

- মানে? কি এমন ছবি দেখছিস যে আমাকে বলা যাবে না?

- আরে বাবা তেমন কিছু না, মজা করলাম। আসলে গেম খেলছিলাম, এনএফেস-সিক্স। তা তুই এত রাত পর্যন্ত জেগে আছিস কেন? প্রায় একটা বাজে।

- ঘুম আসে না। কি করব?

- একটা বিয়া কর তাইলেই ঘুম আসবে।

- ধ্যাত! তিশা ফোন কেটে দেয়। তার ঘুমানো উচিৎ। কিন্তু ঘুম আসে না। তাই জেগে থাকে একা একা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে সে তো একা নয়। আকাশে এক ফালি চাঁদও তার মত জেগে আছে। তবে চাঁদটা বড় বিষন্ন।

হরতালের শেষ বিকেলে

শেষ বিকেলে ঘুমটা ভাঙতেই আজকে আর বাসায় থাকতে ইচ্ছা করল না। হরতালের বিকেলে গুলশান বনানীর ফাঁকা রাস্তাতে রিকশায় ঘুরে বেড়ানোর মজাই আলাদা। কিন্তু একা একা তো আর ঘুরতে ভাল লাগে না। অগত্যা মোবাইলের সাহায্যপ্রার্থী হতে হল। কিন্তু যাকেই ফোন দিলাম সে-ই ব্যস্ত! এক ফ্রেন্ডকে বললাম তুই যা খেতে চাইবি তাই খাওয়াব। সে রাজি হল না! আফসোস! কাউকেই পেলাম না। মনটা একটু খারাপ হল। একটু অসহায়বোধ হল। যা শালা! আমার কাউকেই দরকার নেই। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে...

গুলশান বাড্ডা লিংক রোডে লেকের পাড়ে আজকে এত বাতাস! কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রতিদিন এই পথ দিয়েই আমাকে অফিসে যেতে হয়। অবশ্য তখন এত কিছু খেয়াল করে দেখার সময় হয় না। রাস্তায় তেমন গাড়ি নেই। রিকশাগুলো যেন পাল্লা দিয়ে চলছে। এক রিকশায় দেখলাম একটা ছেলে আর একটা মেয়ে আইসক্রিম খেতে খেতে যাচ্ছে। মেয়েটা ছেলেটার দিকে আইসক্রিম বাড়িয়ে দিয়েছে, ছেলেটা যেই না ওটাতে কামড় দিতে গেল তখনই সব আইসক্রিম পড়ে গেল আর তার বিশাল হাঁ আইসক্রিমের কাঠিতে বাড়ি খেয়ে চুপসে গেল! আহারে বেচারা!

দেখলাম পঙ্গু ভিখারিটা যথারীতি বসে বসে ভিক্ষা করছে। দুই একটা গাড়ি পার্ক করা আছে। এই লিংক রোডের দুই ধারে মাছ মাংস তরকারি সবই বিক্রি হয়। কেউ কেউ কিনে নিচ্ছে। একটা ১৭/১৮ বছরের ছেলেকে দেখলাম নানান ধরনের সিডি বিক্রি করছে। আমাকে বলল, মামা, লাগবে? দেশি আছে! আমি কোন কথা না বলে পা বাড়ালাম। গুলশান-১ এর মোড়ে এসে মনে হল এখন

কোথায় যাব? চারদিকে চার গন্তব্য! কোনদিকে যাই! হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠল -দোস্ত আলিফের ফোন! যাক একা আর ভেগাবন্ডের মত ঘুরতে হবে না।

বনানী-১১ যেতে যে ব্রিজটা পড়ে সেটা আমার খুব ভাল লাগে। এ যেন অদ্ভুত এক সেতু বন্ধন। ব্রিজের এক পাশে সীমাহীন প্রাচুর্যের মাঝে মানুষের বসবাস আর ঠিক অপর প্রান্তে দরিদ্র জীবনের দীর্ঘশ্বাস! ব্রিজের উপর দিয়ে

হাঁটতে অনেক ভাল লাগছিল। ঝিরঝিরে বাতাস! শেষ বিকেলের নরম রোদে ঘামের চরম জ্বালা আজকে নেই। ইশ লেকের পানিটা যদি একটু পরিস্কার হত! আজকে এখানে অনেক লোকজন! কেউ জোড়া! কেউ বা ছাড়া! কেউ এসেছে দল বেঁধে! বেশ ক্ষুধা লেগেছে! কিছু একটা খাওয়া দরকার! আমরা হাঁটতে হাঁটতে ১১ নম্বরের শেষ মাথায় চলে এলাম। ঢুকে পড়লাম কিংসে! একটু পরে খাবার নিয়ে ভিতরে বসতে গিয়ে দেখলাম non smoking জোনে কোন সিট ফাঁকা নেই। তাই বাধ্য হয়ে smoking জোনে বসতে হল। সেখানে অবশ্য লোকজন ছিল না। আমরা ছাড়া আমাদের পাশের টেবিলে একজোড়া ছেলে মেয়ে বসে ছিল। ছেলেটা কোক খাচ্ছিল আর মেয়েটা টানছিল সিগারেট! এত সুন্দর একটা মেয়ে সিগারেট খাচ্ছে! এ দৃশ্যটা দেখে কিছুটা হলেও কষ্ট লাগল। যদিও এমন দৃশ্য এর আগে আমি বহুবার দেখেছি। তবুও আজকে কেন জানি একটু বেশিই খারাপ লাগল। আমি জানি আড়ি পাতা ঠিক নয়। কিন্তু এই বেঠিক কাজটাই আজকে করলাম। খেতে লাগলাম মুখ দিয়ে আর কান দিলাম ওদের দিকে!

ছেলেটা বলছে, আর কত খাবি? তুই তো ভাতের মত সিগারেট খাচ্ছিস!

- আমার যা ইচ্ছা তাই করব তাতে তোর কি!

- না আমার আবার কি! কিন্তু কাজটা ঠিক হচ্ছে না।

- কিসের ঠিক! ও কেন আমার সাথে এমন করল?

- কি করেছে!

- তুই জানিস না! আমার সাথে মজা নেস! হারামজাদা!

- শিট। নব পড়ড়ষ ইয়ার!

- তোর বি কুলের মায়রে... !

আমার আড়ি পাতার ইচ্ছাটা এখানেই শেষ হয়ে গেল।

.....